পরিচয়

মে-জুলাই ১৯৯৭
বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪
১০-১২ সংখ্যা ৬৬বর্ষ

প্রবন্ধ

বিশেষ রচনা

গল্প

পরিচয় ঃ বিষয়সূচি

আলোচনা

কবিতা

পুস্তক পরিচয়

বিয়োগপঞ্জি

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ
রঞ্জন ধর

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সবকাব বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশকমণ্ডলী
হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস
সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

রমেশচন্দ্র সেন ঃ নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

আমিনুল হক

সে ছিল এক যৌবনের কলকাতা। বাসনওলার থালা বাজিয়ে ঘোরাঘুরি, চিকের আড়াল থেকে সুসজ্জিতা রমণীদের উৎসুক চাউনি, বড় রাস্তার মোড়ে মহরমের মিছিলের জটলা আর সরু গলিতে ভিস্তিওলাদের জলদানের প্রতিশ্রুতি। উত্তর কলকাতার ঠনঠনে এলাকার দুশো এক নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে ভেষজের সুবাস আর নিরালোক পরিমণ্ডলের ঘরখানি। চারদিকে অগোছালো জিনিসপত্র। ওষুধের শিশি, জলের পাত্র আর কাথজের পুরিয়া—এ সবের মধ্যেই বনস্পতির মতন এক দীর্ঘদেহী মানুষ। বয়স হয়েছে। শরীরের চামড়ায় চিত্র-বিচিত্র বঙ্কিম রেখা। সামনের দিকে চুল ক্রমশ পাতলা হতে শুরু করেছে। প্রশস্ত হচ্ছে কপালের ভূগোল। গায়ে সাধারণ একটি পাঞ্জাবির মোড়ক। একটি চোখ সম্পূর্ণ অচল এবং অপরটিও কঠিন ছানির আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। পাশাপাশি দুরন্ত অ্যানজাইনার তীব্র পীড়নে মানুষটি পীড়িত। রীতিমত পীড়িত। কণ্ঠনালীতে যেন বিষের ধোঁয়ার অনুরণন। উঠতে বসতে শ্বাসকষ্ট। স্বাভাবিক জীবনচর্যায় বাধা নানারকম। সাংসারিক অসচ্ছলতা আর দরিদ্র রোগীদের সাহচর্যে দুশো এক নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের এই গোলকধাঁধার মতন বাড়িটিতে তবু কিসের যেন সমারোহ। রোগীদের মধ্যেও কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে মৃদু আলোচনা করেন। কোবরেজ মশাই নাকি শুধু গাছগাছড়ার ওষুধই দেন না। লেখেন। বই লেখেন। সে সব লেখা কাগজে ছাপানো হয়। ভাল বলেন। খারাপ বলেন। দরিদ্র রোগক্লিষ্ট মানুষটির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কোবরেজ কাদের কথা লেখেন! জানতে ইচ্ছে হয় ওদের। হরিদা মানে কোবরেজমশায়ের ডান হাত হরিদাস রায়চৌধুরীর কাছে সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলেন একজন। হ্যাঁ, অনুমান সত্যি। কোবরেজমশাই লেখক মস্ত লেখক। তাই তো সকাল সন্ধে অত ভাল ভাল লোকের জটলা। আরও বেশি বেশি ভালবাসতে ইচ্ছে করে কোবরেজকে। রোগীদের সঙ্গে কোবরেজ মানুষটির গড়ে উঠেছিল এক আন্তরিক সম্পর্ক। মহানুভব সেই বিখ্যাত কোবরেজ মানুষটিই হলেন রমেশচন্দ্র সেন। একদিকে পারিবারিক চিকিৎসাবিদ্যা,

অপরদিকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম—দুটোকে এত সঙ্গে মিলিয়েছিলেন অতি আশ্চর্যভাবে। বাংলার ভেষজবিদ্যার অনুশীলন ছিল তাঁর একমাত্র পেশা। আর এই পেশার সঙ্গে দূর দূরান্ত থেকে আগত মানুষের যে সাহচর্য—তাই ছিল তাঁর লেখার অন্যতম বিষয়। সমাজের নানা স্তরের নারী-পুরুষের মুখের মানচিত্র আশা, হতাশা, দীর্ঘশ্বাস—সব কিছু মিলে রমেশচন্দ্র সেনের লেখনীতে হয়ে উঠত অপূর্বতর। তাঁর প্রতিটি অক্ষরকণিকার পিছনে তাই এই সব সাধারণ মানুষগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকেই যায়।

রমেশচন্দ্র সেন,-বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ভূগোলে তাঁর অবদান যথেষ্ট হলেও পাননি তিনি উপযুক্ত মর্যাদা।

বিশেষভাবে অনুরাগী পাঠক ছাড়া সচরাচর শুধুমাত্র তাঁর নাম শুনেছেন এমন পাঠকের সংখ্যাও দুর্লভ। রমেশচন্দ্র সেনের বইয়ের সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ার প্রকাশকদের নেই কোনও সম্পর্ক। প্রচার মাধ্যমের দাক্ষিণ্য থেকে তাঁর যোজন দূরে অবস্থান। রমেশচন্দ্র সেন নিজে সাহিত্যিক। এক বড়-সড় সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মূল পরিচালকের দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও আজ বিশেষ কোনও 'গোষ্ঠী' তাঁকে নিয়ে ভাবেন না। এই রমেশচন্দ্র, যিনি আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে তবু তিনি এখনো কিছু গ্রন্থকীটের আদরের বস্তু। ব্রাত্য, অবহেলিত সমাজের মুখপাত্র রমেশচন্দ্র সেন সবার অজান্তে নিজেই কখন যে ব্রাত্যজনের একজন হয়ে গেছেন! আসলে মনুষ্য প্রজাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে—স্মৃতিবিভ্রম। আজ যে লেখক সাফল্যের শীর্ষদেশে অবস্থান করছেন, কালকেই বাঙালি পাঠক বেমালুম ভুলে যাবেন তাঁকে। এই স্মৃতিভ্রষ্টতার কারণেই রমেশচন্দ্র সেনের মতন ক্ষমতাবান এবং প্রতিভাপূর্ণ লেখকও আমাদের অনেকের অজানা থেকে যান। অচেনা হয়ে থাকে তাঁর সুমহিমময় অমৃতলেখনী। এক ধরনের নীরবতার উপেক্ষিতসঙ্গী হয়ে থাকেন রমেশচন্দ্র সেন নামক আশ্চর্য মানুষটি।

অবিভক্ত বাংলার এই টুলো পণ্ডিত, লেখক এবং কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেনের জন্ম শতাধিক বছর আগে উত্তর কলকাতার চোরবাগান এলাকায়। বাংলা মতে সেদিনের তারিখটি ছিল ১৩০১ সালের ৭ ভাদ্র, ইংরেজি ২২ আগস্ট, ১৮৯৪। সেন পরিবারের আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগনার পিঞ্জরি গ্রামে। পিতা ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ছিলেন পেশাগতভাবে এলাকার সুবিখ্যাত কবিরাজ। মায়ের নাম বরদাসুন্দরী। ক্ষীরোদচন্দ্র তরুণ বয়সেই বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতায় স্থায়ী হন। এবং উত্তর কলকাতার

এই চোরবাগান এলাকাই হয়ে ওঠে তাঁর কর্মচঞ্চল বিচরণভূমি। ইতিমধ্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ঘটেছে বিস্তর পরিবর্তন। ওপার বাংলার সঙ্গে এপার বাংলার যোগাযোগ আইনের নিষেধাজ্ঞায় সীমায়িত। ইচ্ছে করলেই আর যে কোনও সময় আসা-যাওয়া হয়ে ওঠে না। পিঞ্জরির বাড়িতে থেকে গেলেন জ্যাঠাইমা দীনমণি দেবী। অকালে স্বামী বিয়োগের ঘটনায় দীনমণিও যেমন যেন বদলে গেছেন। শুধু বেঁচে থাকা। জীবনের সাধ-আহ্লাদ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দীনমণির নিঃসঙ্গ পৃথিবী বড়ই নিস্তরঙ্গ। রমেশচন্দ্র এবং অন্যান্য ভাইবোনদের কাছে দীনমণির পরিচয় 'বড়মা। চোরবাগানের ছোট্ট বাড়িটিতে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে 'বড়মা'র জন্য মন কেমন করে। ওদিকে পিঞ্জরির বাড়িতে চাঁদের আলো যখন পৃথিবী ভাসিয়ে দেয়—আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কার কথা, কিসের কথা ভেবে ভেবে কষ্ট পান দীনমণি। এ পার ও পারের অবস্থানিক দোটানায় বালক রমেশচন্দ্রেরও ভীষণ কষ্ট হত। বালবিধবা 'বড়মা' দীনমণি রমেশচন্দ্রকে ঘিরে ছিলেন অনেকখানি।

চার ভাই দুই বোনের পরিবারে রমেশচন্দ্র যেমন লেখালেখির জগতে বিখ্যাত হন, অন্যরা তেমন নাম করেননি কেউ। পিতা ক্ষীরোদচন্দ্র কবিরাজি পেশায় গোটা কলকাতা জুড়ে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় হয়েছিলেন। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, কলকাতা মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ডাঃ ক্যাল-ভার্টসনের সঙ্গে ছিল তাঁর নিকট সম্পর্ক। পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্রের এক ভাগনে অমিয় দাশগুপ্ত বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা পরিচিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র সেনের অকালবিয়োগ যখন ঘটে তখন রমেশচন্দ্রর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। ছোট বড় অনেকগুলো মুখের সংসারে একমাত্র অধিকর্তা হলেন অসহায় রমেশচন্দ্র।

রমেশচন্দ্র সেনের শিক্ষাজীবনের সূচনা প্রাথমিকভাবে পিতা ক্ষীরোদচন্দ্র সেনের কাছে হলেও তাঁর জীবনে এক বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিতের অবদান অনস্বীকার্য। সেই নিরহংকার পণ্ডিত মানুষটির নাম সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ। হাতিবাগানের এই পণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতুষ্পাঠীতে বালক রমেশচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্য ও লোকায়ত জীবন দর্শনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন গভীরভাবে। স্বভাববিনয়ী বালক রমেশচন্দ্রকে পরম আন্তরিকতা দিয়ে গড়ে তুলতে থাকেন পণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ এই সময় তাঁর ঐতিহ্যবাহী টোলের সীমায়িত গণ্ডীতে। পড়াশুনোতে অন্য অনেকের

থেকে ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই সময় রমেশচন্দ্র হয়ে ওঠেন সেরা ছাত্র। স্বাভাবিকভাবেই সীতানাথের মনোযোগের অনেকখানিই আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রিয় ছাত্র রমেশচন্দ্র সেন। তাঁর নিজের কথায়—"বাবা ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ। খুব তাঁর নামডাক। আমারও ইচ্ছে কবরেজ হই। কাজেই টোলে ভর্তি হয়ে পড়লাম। ম্যাট্রিকটাও তাই দেওয়া হল না। কিন্তু টোলের পয়লা নম্বরের ছাত্র। টকটক করে সংস্কৃত বোর্ডের তিনটে পরীক্ষায় পাস দিলাম। আর পাস বলতে পাস, একেবারে ফার্স্ট। টোলের সেরা ছাত্র আমি। আমায় নিয়ে টোলের গৌরব।" পণ্ডিত সীতানাথের টোলের পড়া শেষ করে রমেশচন্দ্র প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি হলেন। এবং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পাস করলেন। একের পর এক পরীক্ষা পাশের দুর্মর নেশা তখন তাঁর রক্তে। এফ এ পাস করলেন। ভর্তি হলেন বাড়ির কাছেই বিদ্যাসাগর কলেজে। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে। সেই সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অনগ্রসর এক ছাত্রের পক্ষে ইংরেজি অনার্স পড়া সহজসাধ্য—ছিল না। উল্লেখ্য, বালক রমেশচন্দ্রর সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগে যেমন পণ্ডিত সীতানাথ—সাংখ্যতীর্থের গভীর আন্তরিকতা ছিল অনুরূপভাবে তাঁর ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের পেছনে ছিল 'বড়মা' দীনমণি দেবীর ঐকান্তিক ইচ্ছের সম্ভার। বড়মা চেয়েছিলেন তাঁদের বাড়ির কেউ ভালভাবে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করুক। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রমেশচন্দ্র বি এ অনার্স পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তিনি বাংলা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করেন। এর কাছা-কাছি সময় বাবা ক্ষীরোদচন্দ্র সেনের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাই উচ্চশিক্ষার পথে বাধা পড়ে। স্নাতক রমেশচন্দ্রর স্নাতকোত্তর হওয়ার শুভ ইচ্ছা গোপন সিন্দুকে বন্দি হয়ে যায় আপনা থেকেই। যুবক রমেশচন্দ্র অগত্যা বাধ্য হয়েই পারিবারিক পেশা আয়ুর্বেদ অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। তরুণ প্রাণচঞ্চল দামাল যুবক ক্রমশ হয়ে উঠলেন উত্তর কলকাতার জনপ্রিয় কবিরাজ, ১৯১৮—১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় এক আয়ুর্বেদের সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বক্তা হিসেবে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক গবেষণা সমৃদ্ধ আয়ুর্বেদীয় জ্ঞানে তিনি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে দেন। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এই আয়ুর্বেদ সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বাংলার এই নিষ্ঠাবান কবিরাজকে যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করা হয়। রমেশচন্দ্রর নামের শেষে যুক্ত হয় নতুন একটি গৌরবজনক উপাধি—'বিদ্যানিধি'।

রমেশচন্দ্র যখন দুরন্ত যুবক, গোটা বিশ্বে তখন ঘটতে থাকে একের পর এক সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থানপতনের ঘটনা। রাশিয়ার সাড়াজাগানো বৈপ্লবিক চিত্রের পাশাপাশি প্রথম মহাযুদ্ধের দুঃসহ ক্ষতচিত্রে গোটা বিশ্বের সচেতন মানুষ বিস্মিত, বিমূঢ়। নতুন সৃষ্টিকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বিধ্বংসী তান্ডবও শান্তিপ্রিয় মানুষদের শান্ত চিত্তকে পীড়িত করে গভীরভাবে। দেশীয় ঐতিহ্য, আন্তর্জাতিক দোলাচল এবং অতি নিকট থেকে দেখা জীর্ণ শীর্ণ রোগীদের শোক কাতর মুখের রেখা রমেশচন্দ্রের অভিজ্ঞতাকে করে তুলেছিল সমৃদ্ধতর। মাথার মধ্যে অজস্র চিন্তার বাস। লতাপাতা, জড়িবুটি, শেকড়-বাকড়ের জটিল চিত্রজালের আড়ালে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুঁজে ফেরে মানুষকে। যে মানুষ মানুষকে ভালবাসে। এই সময় কবিরাজ হিসেবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও আর্থিক উপার্জনের ঘর ছিল প্রায় শূন্য। সমাজের নিম্ন অর্থনীতি থেকে আগত রোগীদের কাছ থেকে পয়সা নিতে তাঁর খুব কষ্ট হত। তবু বাধ্য হয়ে নিতে হত প্রায় সময়। আবার অনেক সময় সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে তিনি রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ক্রমশ দারিদ্র্য তাঁকে বেঁধে ফেলছিল কঠিন অক্টোপাসের মতন। অগত্যা নিরুপায় রমেশচন্দ্র বৈদ্যশাস্ত্র পীঠে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন। যদি কিছু বেশি পয়সা দিয়ে নিরন্ন পরিবারকে সাহায্য করা যায়। এখানেও মুক্তি নেই। গল্পকথার ব্যর্থ নায়কের মত বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন তিনি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় রমেশচন্দ্র পুনরায় কর্মহীন হলেন। ফিরে গেলেন আপনার নিজস্ব জগতে, মুক্তারামের উপদ্রবের কর্মভূমিতে। দুর্বহ অর্থনীতি তাঁকে একদণ্ড স্থির হয়ে ভাবতে দেয়নি।

কবিরাজিকেই তাঁর একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও রমেশচন্দ্র জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। আরামপ্রিয় নাগরিক বৃত্তের বাইরেও যে গ্রামের মানুষের বিপন্নতা—তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হৃদয় দিয়ে। শহরে, শহরতলিতে এবং প্রত্যন্ত গ্রামের অভ্যন্তরে চিকিৎসার ব্যাপারে যেতে তিনি সামান্য দ্বিধা করতেন না। তিনি জানতেন তাঁদের দুঃসহ জীবনযাপনের কঠিনতর গ্লানি। অস্তিত্বের সংগ্রামে মফস্বলের নিরন্ন আধা অনাহারী মানুষগুলোর হতাশা, দুঃখ দারিদ্র্য রক্ত অশ্রু ঘাম—তাঁকে অস্থির করে তুলত। অসহায় কবিরাজ ভেতরে ভেতরে কষ্ট পেতেন। ক্ষয় হতেন। বলাবাহুল্য, তাঁর সেই

কষ্টের প্রকাশ তিনি স্বাভাবিকভাবে করতে পারতেন না। কষ্ট লাঘবের সঠিক উপায় তাঁর জানা ছিল না।

১৩১৮ সালের ১২ আষাঢ় (ইংরেজি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস) তারিখে রমেশচন্দ্র সেন গড়ে তোলেন নিজস্ব এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী। উল্লেখ্য, এর আগে রমেশচন্দ্রর সাহিত্যজগতে প্রবেশই ঘটেনি। পিতৃদেব তখনও জীবিত ছিলেন। প্রথম পর্যায়ে এই গোষ্ঠীর নাম ছিল সাহিত্য প্রচার সমিতি। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত নাম হয় সাহিত্য সেবক সমিতি। সাহিত্য সেবক সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা স্মারকগ্রন্থে রমেশচন্দ্র যে ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী সমিতির দীর্ঘ ইতিহাস লেখেন তা থেকে জানা যায় সমিতির অনেক অজানা ইতিহাস। তাঁর নিজের কথায়—"পিতৃদেব ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ছিলেন কলকাতার একজন গণ্যমান্য কবিরাজ। যে যুগে কবিরাজদের আয় ও সমাজে তাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তির কথা শুনলে একালের ছেলেরা মনে করবেন গল্প বলছি। আমার বাবার কাছে পনের থেকে বিশ জন আয়ুর্বেদ পড়তেন। আমাদের বাড়িতেই থাকতেন আট-দশজন। তাঁদের জন্য পৃথক একটি ছাত্রাবাস ছিল। একদিন পিতৃদেবের অন্তেবাসীদের নিকট একটি সাহিত্যসভা গঠনের প্রস্তাব করি। তাঁরা সানন্দে সম্মতি দেন। সভার প্রতিষ্ঠা হল। নাম হল—সাহিত্য প্রচার সমিতি। কবিরাজি পড়ুয়ারাই সভাপতি, সহ সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। আমি হলাম সহ সম্পাদক।"

প্রথম সম্পাদকের নাম ছিল অনাদিনাথ ভট্টাচার্য। এই সাহিত্য সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনেই যেমন নামের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো হয়, তেমনই সমিতির সদস্য সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাত্র দু মাসের মধ্যেই সদস্য সংখ্যা তিরিশ-চল্লিশ হয়ে যায়। সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন অধিবেশনে আবৃত্তি করতেন। কখনও নিজের লেখা পড়ে শোনাতেন। উপস্থিত শ্রদ্ধাভাজনদের মধ্যে যেমন টোলের পণ্ডিতরা ছিলেন তেমনই কলেজের অধ্যাপকদের কয়েকজন ছিলেন এই সমিতির নিয়মিত ব্যক্তিত্ব। অন্যান্য যাঁদের উপস্থিতিতে সমিতির আসর জমজমাট থাকত বিভিন্ন সময়, তাঁরা হলেন—শিবনাথ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নজরুল ইসলাম, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাজি আবদুল ওদুদ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, নরেন্দ্র দেব

প্রমুখ অনেকেই। শুধু সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বই নয় বিশিষ্ট গায়ক শচীন দেববর্মন, আব্বাসউদ্দিন আহমেদ প্রমুখরাও এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রথম বৎসর সভাপতির আসনে ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। যে কোন সময় তিনি এই সভার জন্য সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আন্তরিক আলোচনার সঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ দিয়ে তিনি সমিতির কাজকর্মকে করেছিলেন পুষ্টতর। দ্বিতীয়বার সভাপতি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একদা নামজাদা বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ষে সর্বজনমতানুসারে সমিতির স্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন যোগীন্দ্রনাথ বসু। তিনি মূলত মাইকেলের জীবনীকার হিসেবে সুপরিচিত। প্রথম দু'বছর সমিতির কোন মাসিক চাঁদা ছিল না। উপরন্তু উপস্থিত সদস্যদের জন্য বিশেষ জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। কাছেই বীণা সিনেমার কাছে গোকুলের চায়ের দোকানে একের পর এক চা ইত্যাদির অর্ডার যেত। একান্ত সহযোগী হরিদাস চৌধুরীর স্বভাবসুলভ আন্তরিকতায় উপস্থিত গুণী মানুষগুলো প্রায় সব দিনই নিদেন-পক্ষে এক কাপ চা অন্তত পান করে যেতেন। গোকুলও অপেক্ষা করে থাকতেন কবিরাজ বাড়ির আলাপী অর্ডারের জন্য। কাজেই সমিতির যাবতীয় ব্যয়ভার রমেশচন্দ্রর পিতা ক্ষীরোদচন্দ্রকেই বহন করতে হত। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় যে সময় সম্পাদকের পদে বৃত ছিলেন সেই সময় সমিতির সভ্যদের জন্য মাসিক দু' আনা চাঁদার প্রবর্তন করা হয়। এতে কবিরাজ পরিবারও কিছুটা অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়।

রমেশচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত এই সাহিত্য সেবক সমিতির একান্ত ইচ্ছে ছিল কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে তাদের নিকটে আনবার। সেই মত প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া হল দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে। উনি হাসি মুখে সম্মতি জানালেন। আশীর্বাদ জানালেন সমিতির সাফল্য কামনা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর কিছুদিন পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পার্থিব জগৎ ছেড়ে যান। দ্বিজেন্দ্রলালকে আর সমিতি নিজেদের কাছে পাওয়ার কোন সুযোগ পায়নি।

সমিতির বয়স যখন প্রায় তিন বছর, সেই সময় পরিকল্পনা করা হয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবাসরের। প্রথম বঙ্কিমসভা অনুষ্ঠিত হয় গোলদিঘিস্থ সিটি কলেজ হলে। সভাপতি ছিলেন সেকালের প্রাজ্ঞ সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

রমেশচন্দ্র সেন শুধু সাহিত্যিক পরিমণ্ডলেই থাকতেন তা নয়; শিল্পী,

রাজনৈতিক মানুষেরাও তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হতেন। এর মধ্যে গান্ধীজির প্রথম অসহযোগ গোটা বাংলাদেশে প্লাবিত হয়ে যায়। সমিতির অনেকেই গান্ধীজির নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়েছিলেন। একই সঙ্গে কবিরাজি, সাহিত্যচর্চা দেশাত্মবোধ, শিল্প-সংস্কৃতিচর্চা—প্রভৃতির অপূর্ব মিলনে প্রয়াসী হয়েছিলেন এখানকার সবাই। কলকাতার এই প্রাচীনতম সাহিত্য সমিতির আসরে একদিকে যেমন কমিউনিস্টদের আনাগোনা; তেমনই গান্ধীবাদী আদর্শের লোকেদেরও অভাব হত না। জাগতিক ঘটে যাওয়া প্রায় সমস্ত ব্যাপারে তাঁর ছিল তীব্র অনুসন্ধিৎসা। কঙ্গোর বীর সন্তান প্যাট্রিক লুলুম্বার কদর্য এবং নিষ্ঠুর হত্যার ঘটনায় রমেশচন্দ্র ব্যথিত হয়েছিলেন সমানভাবে। প্যাট্রিক লুমুম্বার এই বর্বরোচিত জঘন্য হত্যার পরিপ্রেক্ষিতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেখিয়ে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসেবক সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় বাংলার উৎসাহী মানবতাবাদী কবিসমাজ লুলুম্বার উদ্দেশ্যে যে 'হায় ছায়াবৃতা' নামে এক বিশেষ কবিতার সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, তাতে রমেশচন্দ্রর উৎসাহের অন্ত ছিল না। 'হায় ছায়াবৃতা' প্রকাশের এই সময়ের চিত্র ধরা আছে সমকালীন আর একজন প্রতিভাবান কথাকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে। সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুপম স্মৃতিকথায় ঘটনাটি স্মরণ করেছেন এইভাবে—"আশ্চর্য হই রমেশচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা ও জাগতিক সর্বব্যাপারে প্রবল কৌতূহলে। লুমুম্বার হত্যার পর—'হায় ছায়াবৃতা' নামে বাঙালী কবিদের কাব্যসংকলনের প্রকাশ সংবাদে উৎফুল্ল রমেশচন্দ্র বর্তমান লেখককে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন। আগ্রহে যখন তাকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করে শোনানো হল তখন রমেশচন্দ্রের সেই অভিব্যক্তি অবিস্মরণীয়।"

রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য সেবক সমিতির নৈকট্য বাংলা সাহিত্যের একাধিক দিকপালের স্মৃতিচিত্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটেই কাছাকাছি প্রতিবেশী হয়ে থাকতেন রসিক লেখক শিবরাম চক্রবর্তী। তাঁর সুবিখ্যাত দীর্ঘ আত্মজীবনী 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' গ্রন্থে শিবরাম লিখেছেন—"চোরবাগানের চৌহদ্দিতে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের মোড়টাতেই ছিল রমেশবাবুর (কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেন) কবিরাজখানা, যেখানে ছিল স্থাপিত একদা বিখ্যাত সাহিত্য সেবক সমিতি। সাহিত্যছত্রের পদাতিক কবি থেকে রাজতুল্য লেখকরাও এসে জমতেন—তাঁর সেই কবিরাজী আড্ডায়। নিয়মিত—

ভাবেই ঐ সময়ের বৈঠক বসত। সাহিত্যিকদেব ওঠাবসা যাওয়া-আসা গল্পগুজব চলত প্রায় সব সময়। আমিও মাঝে মাঝে ওখানে গিযে ও'দের সাহিত্যভোজে খাদ্যাখাদ্যের অংশ নিযেছি—সাহিতোর সেই কবিবাজী কাটলেট-উইথ এ পিন্‌চ অব ভাস্কর লবণ।" শিববাম চক্রবর্তী আবও লিখছেন—"ঐ সমিতিটি সেইকালে আমার খুব কাজে লেগেছিল। আমাব কাছে সাহিত্য আলোচনার জন্য উৎসুক কেউ এলে, হবু সাহিত্যিকবাই বেশিবভাগ আমি তাদেব রমেশবাবুব ঐ আডতে নিযে গিযে ছেড়ে দিতাম। বমেশবাবু আনন্দে নিজেব সমিতিব সভা হিসেবে তাদের লুফে নিতেন। আব তাবাও মাসিক চাব আনা মাত্র চাঁদার বিনিময়ে ঢালাও আড্ডা আব আলোচনাব সুযোগ পেত—সেই সঙ্গে চা কচুরি সিঙ্গাড়া তো মিলতই। সেদিক দিযে ওটা ছিল আমাব ডাম্পিং গ্রাউণ্ড।"

এছাড়া তাবাশংকব বন্দ্যোপাধ্যাযেব স্মৃতিকথা 'আমাব সাহিত্য জীবন' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাযেব 'তবী হতে তীব' প্রভৃতি বিখ্যাত আত্মকথায বমেশ-চন্দ্র সেন এবং তাঁর সাহিত্য সেবক সমিতি যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থায়িত্ব লাভ কবেছে। সাহিত্য সেবক সমিতিতে তিনি ছিলেন সকলেব 'দাদা'। বয়োঃ-জ্যেষ্ঠ হিসেবে তিনি যশোপ্রার্থী নবীন লেখকদেব লেখা সংশোধন, সংযোজন ও বর্জনেব নির্দেশ দিতেন। নিজে পকেটে কবে সেই সব লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাব সম্পাদকীয় দপ্তরে পেঁৗছে দেবাব দাযিত্ব পালন করে সবাইকে অবাক কবে দিতেন। এই লেখকদেব কেউ যখন পরবর্তীকালে কোনও ভাবে নাম কবতেন তখন বমেশ-চন্দ্র নিজে থেকেই অন্যদেব ডেকে লেখা পড়াব জন্য অনুবোধ কবতেন।

রমেশচন্দ্র সেন ব্যক্তি জীবনে সাহিত্যেব পাশাপাশি বাংলাব বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসংগীতেব প্রতি আগ্রহী ছিলেন বিশেষভাবে। বাংলাব আনাচে-কানাচে ছড়িযে বয়েছে লোকসংগীতের অপূর্ব সম্ভার তা সংগ্রহেব জন্য নিকটজনদেব উৎসাহিত করতেন।

আব্বাসউদ্দিন, শচীন দেববর্মণ প্রমুখদেব কাছে তিনি এই লোকসংগীতেব অমৃতসুধা পান কবতে ভালবাসতেন। 'আমায এত বাইতে ক্যানে ডাক দিলি প্রাণ কোকিলাবে—' শুনে তিনি ফবিদপুবেব পিঞ্জরি গ্রামেব কথা মনে কবে আকুল হতেন। পিঞ্জরিতে নাম না জানা বৈবাগী গান করে ঘুবে বেড়াত—তার কথা মনে কবে অদ্ভুত এক বিযাদে আচ্ছন্ন হযে থাকতেন। লেখালেখির মধ্যে ব্যস্ত থাকাকালীন অবস্থাতেও শুধুমাত্র বৈব্যগীব একতাবা শুনে উতলা হতেন শিশুব মতন মানুষটি। শত ব্যস্ততাব মধ্যেও ট্রেন ছেড়ে দিযে দাঁড়িযে থেকেছেন ঘণ্টার

পর ঘণ্টা। সেকালের ঢাকুরিয়া স্টেশনের জনবিরল সন্ধ্যায় নামহীন লোকগায়ক গেয়ে বলেছেন 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে'। আবেগপ্লুত রমেশচন্দ্রের দুই চোখের কোণে তখন চিকচিক করছে নিটোল কয়েক বিন্দু মুক্তো।

রমেশচন্দ্র সেনের প্রথম লেখা 'বাজার বানর' ও 'দারিদ্রের ক্ষুধা'। সম্পূর্ণ স্যাটায়ারধর্মী ছোট গল্প। বন্ধু-বান্ধবদের দল খুব প্রশংসা করেন তাঁর এই লেখা দুটির। বন্ধুদের উদ্যোগেই বিদগ্ধ সমালোচক ও পণ্ডিত প্রথম চৌধুরীকে সমিতির সভাপতি করে আনা হয়। রমেশচন্দ্র ভয়ে ভয়ে পাঠ করেন তাঁর প্রথম লেখা। বীরবল গল্প সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোন মন্তব্য না করায় তিনি নিরুৎসাহ বোধ করেন। তাঁর স্যাটায়ারধর্মী গল্প লেখার সেখানেই ইতি।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি রমেশচন্দ্রের ছোট গল্প রচনা শুরু হয়। ১৯২৯ থেকে ১৯৬২ এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর রচিত ছোট গল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২১টি। এই তালিকার মধ্যে অপ্রকাশিত গল্প যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে অসমাপ্ত গল্পের নাম। মোট পাঁচটি গল্প সংকলনে এই অতুলনীয় গল্পগুলি গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। তাঁর প্রথম গল্প সংকলনটির নাম ছিল 'মৃত ও অমৃত।' প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পূরবী পাবলিশার্স থেকে। একই বছরে 'কয়েকটি গল্প' প্রকাশিত হয় পূরবী থেকে। পরবর্তীকালে 'তারা তিনজন' 'শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং 'রমেশচন্দ্র সেনের গল্প' প্রকাশ করে' যথাক্রমে প্রফুল্ল কুমুদ লাইব্রেরি, কত কথা এবং আসানসোলের প্রথমত। প্রথমতর উদ্যোগে রমেশচন্দ্রের অন্যান্য রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'অগ্রন্থিত রমেশচন্দ্র'।

সেকালের প্রায় সব নামকরা কাগজে তাঁর গল্প প্রকাশিত হলেও সমকালে তিনি মোটেই গুরুত্ব পাননি। সাহিত্যিক মহলের অভিভাবক বা সুহৃদ হলেও রমেশচন্দ্র সেন নামটি অচিরেই ভুলে যান বাঙালি পাঠক। মাসিক বসুমতী, দেশ, বিচিত্রা, আনন্দবাজার, স্বাধীনতা, নবশক্তি প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় রমেশচন্দ্র'র গল্প প্রকাশের ঘটনা সর্বসমক্ষে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। বাঙালি পাঠকের কাছে এর চেয়ে গভীরতর দুঃখ আর কি হতে পারে। বিষয় বিন্যাস উপস্থাপনা, ভাষাশৈলীর চমৎকারিত্ব তাঁর গল্পের গুণাগুণ যদিও ম্যাক্সিম গোর্কি'র সঙ্গে তুলনীয়। সমাজের অবহেলিত ব্রাত্যজন, চোর, ডোম, ভবঘুরে, কোচোয়ান, মাঝি-মাল্লা, পকেটমার, মুচি, মেথর, কানা-খোঁড়া, জেলখানার কয়েদি, জেলে, রাস্তার মানুষ, গ্রামের অসহায় গৃহবধূ তাঁর গল্পে এক সঙ্গে ভিড় করে আসে। বাংলা সাহিত্যে এ রকম বিপুল বৈচিত্র্যময় চরিত্রের উপস্থিতি খুব কম লেখকের লেখনীতেই

দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীকে তিনি গল্পের চরিত্র হিসেবে উপস্থিত করলেও—সরাসরিরাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করতেতিনি চাননি। তিনি যেমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে 'সাদা ঘোড়া'র মত গল্প লিখেছেন, তেমনই ভিখারীর আশ্চর্য করুণ জীবনকে চিত্রিত করেছেন 'ভিখারীর জন্ম' গল্পে। 'এক ফালি জমি' গল্পটিও ভিখারীদের নিখুঁত চলচিত্র। জনমেজয় আর গণেশ নামক দুই ভিখারীর ভিক্ষাপোযুক্ত স্থান দখলের নিষ্ঠুর সত্য এখানে প্রকাশিত। 'ডোমের চিতা' গল্পে অন্যতম দুই প্রধান চরিত্র বদন আর হারু হলেও এর বিশাল পটভূমি জুড়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ স্তব্ধ শ্মশান। ক্লান্ত শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত দুই ডোমে মৃতদেহের অপেক্ষায় শ্মশানে যে নিরন্তর মুহূর্ত গোনা তার মানবিক আবেদন লেখকের অজান্তেই পেঁৗছে গেছে আন্তর্জাতিক মানে। মৃতদেহ পাওয়া গেলে তাই দাহ করে কিছু পয়সা পাওয়া যাবে—এই যে নিষ্ঠুর অপেক্ষা, পাঠান্তে পাঠক অবশ্যই আঘাতে জর্জরিত হবেন। অস্তিত্বের লড়াই শেষ হয় হঠাৎই সাপের কামড়ে হারুর মৃত্যু ঘটলে। বিপর্যস্ত ডোম বদন রান্নার কাঠের অভাবে হারুর জ্বলন্ত চিতার আগুনে রান্না করতে উদ্যোগী হয়। অতি বীভৎস এই চিত্রে পাঠকের শিহরিত হওয়ার পালা। "সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার, গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য আগুনের হলকা ঢালিয়া দিতেছিল। হারুর চিতার ধোঁয়া সূর্যের জ্যোতিকে ম্লান করিল। তারপর চিতার বুক হইতে উঠিতে লাগিল লোলজিহ্ব অগ্নিশিখা, যেন কতগুলি লাল সাপের ফণা; ক্রুদ্ধ তার গর্জন, অফুরন্ত তার হিংসাবৃত্তি। চিতার দিকে চাহিয়া বদন আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, দূর ছাই, কিছু ভাল লাগে না। আগুনটা আবার নিবে যাবে। এর উপরই চাল চড়িয়ে দি। হারুর চিতায় বদনের চাল চড়িল। বদন একদৃষ্টে হাঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। হাঁড়ির ভিতর চালের সঙ্গেই গোটা দুই মাছ সিদ্ধ হইতেছিল। ফুটন্ত ভাতের টগবগানি, চিতার চড–চডাৎ–চড় শব্দ—তাছাড়া সবই নিস্তব্ধ।" গল্পের পরিসমাপ্তির আশ্চর্য ভাষা ব্যবহারে পাঠক বেদনায় নীল হয়ে যাবেন। "উর্ধ্বে অনন্ত নীল আকাশ চারধারে সীমাহীন জলরাশি—তার মধ্যে বাতাসের তালে ঘাসের পাগল নৃত্য, উচ্ছল জলের সাবলীল ভঙ্গী। দূরে আকাশের বুকে বকের পাতি উড়িতেছে। বৈকাল-সূর্য চিতার ওপর ফাগের গোলা ঢালিয়া দিয়াছে। চিতার আগুন ও সূর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।"

এক বেওয়ারিশ মানবেতর প্রাণীকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন তিনি তাঁর দুবিখ্যাত

'সাদা ঘোড়া' গল্পে। দাঙ্গার পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে যে সীমিত সংখ্যক উৎকৃষ্ট ছোট গল্প লেখা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প এই 'সাদা ঘোড়া'। সোরাব নামক এই সাদা ঘোড়ার গল্প আমাদের অপ্রিয় চিন্তা, অস্থিরতাকে যে ভাবে সরাসরি আঘাত করে তার পরিচয় সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। বস্তুত, এই সোরাব যেন আমাদের সুচেতনারই উজ্জ্বলতম প্রতীক।

রমেশচন্দ্র সেনের এই রকম আরও আশ্চর্য সফল ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করবার মত—'তারা তিনজন,' 'মৃত ও অমৃত,' 'কৈলাস,' 'যৌবন,' 'ভাত' প্রভৃতি। তাঁর গল্পের অবয়বে প্রথম থেকে শেষ অবধি যে মানবতার স্পষ্ট সুর শোনা গেছে তা বাংলা সাহিত্যে সচরাচর মেলে না। পাঠকদের কেবল কারুণ্যের কণ্ঠস্বর শোনানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। চিরব্রাত্য মানুষগুলোর সমর্থনে একটি ইতিবাচক জীবনদর্শন তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। আত্মরক্ষার সংকটকেই তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শতাধিক ছোট গল্প। যে স্যাটায়ারধর্মী বিষয় দিয়ে তাঁর গল্পের সূচনা—সেই জগৎ পরবর্তীকালে শুধু মানবতার কথাই শৈল্পিক কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র সেন মানুষের নিকটস্থ হতে পেরেছিলেন। বাংলা গল্পের দশকাশ্রয়ী তীব্রতায় তিনি ভেসে যাননি কোন সময়েই। তাই হয়ত বোদ্ধা সাহিত্য সমালোচকগণের বিশাল গবেষণায় তিনি তেমনভাবে মর্যাদা পাননি।

'শ্রেষ্ঠ গল্পের' ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যে আমরা তাঁর গল্পের আসল প্রেক্ষিতটিকে মোটামুটি ধরে রাখতে পারি। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন "রমেশচন্দ্রের রচনাশৈলীর যে প্রসাদগুণ, তারও মূলে আছে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ।...উত্তরাধিকারসূত্রে হয়েছেন কবিরাজ এবং কবিরাজের সূক্ষ্ম নিদান জ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে এক অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি চিন্তা কার্যকারণ সম্পর্কিত। কোন কিছুই অকারণে ঘটে না রমেশ সেনের কলমে। সমাজের যত ক্লেদ যত পঙ্ক বহন করে যারা একেবারে নীচের তলায় পড়ে আছে, তাদের পাপ ও ত্রুটি তাই রমেশ সেনের চোখে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। যা তিনি ধরবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, চূড়ান্ত সহানুভূতি দিয়ে, তা হল তাদের সামাজিক ব্যাধিমুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা।"

রমেশচন্দ্র সেনের গল্পের জগৎ যেমন ছিল সচেতন, সেই সচেতনতার চারি-

কাঠিতেই তিনি লেখেন বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। রমেশচন্দ্র সেনের উপন্যাসগুলিকে কালানুক্রমিক তালিকাবন্ধ করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম। শতাব্দী (১৯৪৫), চক্রবাক (১৯৪৫), কুরপালা (১৯৪৬), কাজল (১৯৪৯), গৌরীগ্রাম (১৯৫৩), মালঙ্গীর কথা (১৯৫৪), পূব থেকে পশ্চিমে (১৯৫৬), সাগ্নিক (১৯৫৯), নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ (১৯৫৯), অপরাজেয় (১৯৬০), পূর্বরাগ (১৯৬১), দীপক এবং সেলিবানা। তালিকার মোট তেরটি উপন্যাসের মধ্যে কোনওটির যেমন একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে; তেমনই কোনটি আবার পত্রপত্রিকার পাতাতেই বন্দি থেকে গেছে। 'পূর্বরাগ' এবং 'দীপক' উপন্যাস দুটি সাপ্তাহিক 'দেশ' এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন তারিখ থেকে 'দেশ' এ 'টিকি বনাম প্রেম' নামের যে উপন্যাসটির শুভ সূচনা হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে 'পূর্বরাগ' নামে প্রকাশিত হয়।

বিস্ময়কর কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে যথার্থ কবিরাজ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একাধিক উপন্যাসে। চিরকালীনতার সোচ্চার দাবি নিয়ে তাঁর যে সব উপন্যাসগুলি আমাদের পাঠকদের আলোচনায় বসতে বাধ্য করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শতাব্দী, কুরপালা, কাজল, সাগ্নিক ইত্যাদি।

'শতাব্দী' প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার পূরবী পাবলিশার্স থেকে। শতাব্দীতে লেখক যে সময়, কাল, পরিবেশ এবং মানুষকে দেখার বিস্ময়কর লিপি উপস্থাপন করেছেন, তা বাঙালি পাঠককে বিপর্যস্ত করে। বিগত শতকের শেষদিক থেকে বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত শতাব্দীর কাহিনীর বিস্তার। ওপার বাংলার অপরিমার্জিত ভাষা, রুচিবোধের দীনতায় মোড়া অজ পাড়া-গাঁয়ের পটভূমিকায় শতাব্দীর বিন্যাস। কুনো বৃন্দাবন, জটাই, কুঞ্জসখী এবং জাহানারা—সকলেরই অবস্থান সবার পিছে, সবার নিচে। তাই স্বাভাবিক-ভাবেই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিপদ মাথায় করেই লেখককে এগোতে হয়েছে। পরীক্ষামূলক এই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক তখন অবশ্যই সফল। শতাব্দীতে রাজেশ্বর নামক এক ভূমিজীবী মানুষের বেড়ে ওঠার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এসেছে সামন্ততন্ত্রের জটিলতম চালচিত্র। প্রধান চরিত্র রাজেশ্বর সামান্য জমির মালিক থেকে জমিদার এবং পরে মহাজন তথা পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আসল বৃত্তটাই লেখক অন্যভাবে বলতে চেয়েছেন রাজেশ্বর চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রাজেশ্বর যেন এখানে

একেশ্বরবাদেবই প্রতীক। মঞ্জবী গ্রামেব অগ্নি মণ্ডলের জামাই বাজেশ্বব চরিত্রের মধ্যে লেখক ইতিহাস, সমাজপরিবর্তনের নানান জটিলতা অদ্ভুত নৈপুণ্যেব সঙ্গে প্রকাশ কবতে সক্ষম হযেছেন। জীবনবোধেব আশ্চর্য উচ্চাবণে শতাব্দী আজও মহত্তম সৃষ্টি বলে বিবেচিত। পবিসমাপ্তিতে বাজেশ্বব দেখেছেন কাবখানায় ধর্মঘট, বিদ্রোহ ইত্যাদির পেছনে তাবই পুত্র নবেশ্ববের সক্রিযতা। ব্যথিত হননি তিনি। স্বাভাবিক চিত্তেই তিনি নরেশ্ববের দলকে আশীর্বাদ কবেছেন।

পূর্ববাংলাব এক অতি সাধাবণ গ্রাম কুরপালা; যাব নামে উপন্যাসেব নাম। তাঁব 'কুবপালা' উপন্যাসে তাই ব্যক্তি নয়, প্রধান চবিত্রই হল কুরপালা আব রানীডাঙ্গা নামক পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এই গ্রামদ্বয়েব নানা শ্রেণীব মানুষেব সমস্ত দুঃখকষ্ট, আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাব একত্রীকরণ হযেছে উপন্যাসেব বিশাল পটভূমিতে। কুবপালায বাজনীতিব যে স্থিবচিত্র পবিবেশন কবা হযেছে তাব আনুষঙ্গিতাব ধাবায উপস্থিত হযেছেন বঙ্কিম কুণ্ডু চবিত্রটি। শংকব, ইন্দুপ্রকাশ, নাবায়ণ, সুধাবঞ্জনবাবু, সৌদামিনী সবাই গ্রামীণ জীবনের প্রতিনিধি। উপন্যাসেব অন্যতম চরিত্র বঙ্কিম কুণ্ডু এখানে ইতিহাসের প্রধান বাহক। চবিত্রেব গঠন, গতি-প্রকৃতিব পাশাপাশি ভাষা ব্যবহারেও লেখক এখানে অন্য এক মাত্রা আনতে সক্ষম হবেছেন।

ক্ষযিষ্ণু সামন্ততন্ত্রেব সঙ্গে উঠতি শিল্প বা বণিকতন্ত্রেব প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব কুবপালায বর্তমান। সামন্ততন্ত্রেব করুণতম প্রতীক বামেন্দ্র বাযেব বৈঠকখানায় শুঁড়ভাঙা গণেশেব অবযব দেখিযে লেখক অনেক বেশি কথা বলেছেন।

বমেশচন্দ্রেব 'কাজল' যেন পঙ্কিল জীবনেব অসহায় আর্ত চিৎকার ধ্বনি। 'কাজল'কে সমালোচক সজনীকান্ত দাস আলেকজাণ্ডার কুপবিনেব লেখা 'ইযামা দ্য পিট' এব সঙ্গে তুলনা কবেছেন। এব সঙ্গে ম্যাকসিম গর্কিব 'লোয়ার ডেপথ' এবও কিছুটা মানসিক সাদৃশ্য আবিষ্কাব কবেছেন কেউ কেউ, কাজল এক অর্থে পাপেব ফুল। রূপোজীবিনী যে কযেকজন নাবী চবিত্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষতভাবে স্মবণীয—বমেশচন্দ্র সেনেব 'কাজল' তাদেব মধ্যে অন্যতম। পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক কাজল বুঝি লেখকেব মানসকন্যা। অসীম মমতা আর সহানুভূতি দিযে তিনি যেভাবে 'কাজল' চবিত্রকে এঁকেছেন তাতে এই বোধ হওযা অসমীচীন নয। আসলে লেখকেব কবিরাজি জীবনে অনেক অন্ধকার জীবনেব নাবী ছিল তাঁর চিকিৎসাপ্রার্থী। দুর্বহ এই জীবনগুলির

ওপর তিনি তাই মনের সবটুকু সহানুভূতি ঢেলে দিয়েছেন। অখ্যাত গ্রামের অকালবৈধব্যের শিকার কাজলের পরবর্তী আশ্রয় পতিতাপল্লী। জীবনের এই ধারাবাহিক করুণ এপিসোডে কাজল তার শরীর থেকে রক্তাক্ত ভালবাসাকে বিসর্জন দিতে পারেনি। 'কাজল' তাঁর স্মরণীয়তম এবং মহত্তম বেদনার নীল অনুভব। পতিতাপল্লী নিয়ে রমেশচন্দ্রের আগে এমন সার্থক উপন্যাস তেমন ভাবে আর কোনও বাঙালি লেখক উপহার দিতে পারেননি। প্রায় দুশো বছরের সামাজিক ইতিহাস গ্রথিত হয়েছে এই 'কাজল' উপন্যাসের মধ্যে। জীবনসন্ধানী কবিরাজ লেখক কাজলের মধ্যে মহৎ জীবনকেই খুঁজতে চেয়েছেন। যার অন্য নাম ভালবাসা।

এছাড়া রমেশচন্দ্র সেনের সুবিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে নাম করা যায় সাগ্নিক, গৌরীগ্রাম এবং চক্রবাকের। সাগ্নিকে ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলার রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে অমোঘভাবে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ডজনখানেক তরুণ তরুণী—যারা স্বদেশী মামলায় অভিযুক্ত। পরাধীনতার নিগড় ভেঙে দেশমাতাকে মুক্ত করতে চায় তারা। মুক্তির আদর্শ এই তরুণ-দলের বুকে জ্বেলেছে হোমাগ্নি। সাগ্নিক তাদেরই বীরত্বব্যঞ্জক গল্প। দেশাত্ম-বোধের একটা সুর গোটা উপন্যাসের অবয়বে বহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্র শুভ ভরদ্বাজ এবং সুমিতার পারস্পরিক ইচ্ছার আদান-প্রদানে যে বিপ্লববাদের প্রস্তুতি তাই সাগ্নিকের বিষয়বস্তু। সাগ্নিকে দেশবন্ধুর সহযোগিতায় ঋষি অরবিন্দ ঘোষের জেল থেকে মুক্তি লাভ, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মোহনবাগান ক্লাবের শিল্ড বিজয়, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বাটাভিয়া যাত্রা প্রভৃতি রাজনৈতিক আবহের পাশাপাশি শুভ-শান্তার রোমান্স সম্পর্কের অবতারণা অন্য এক মাত্রা যোগ করেছে। পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শুভ ভরদ্বাজ চরিত্রটি হয়ত বা বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আদলে তৈরি হয়েছে।

গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রমেশচন্দ্র সেন একটিই নাম ; যিনি তাঁর রচনাকর্মে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় রাখলেও শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই মানুষটির নামের সঙ্গে পরিচয় গুটিকয় উৎসাহী পাঠক আর গবেষকের। এখনও অনেক পাঠকের কাছে রমেশচন্দ্র সেন নামটি উচ্চারণ করলে ভেবে বসেন রমেশচন্দ্র দত্ত বা রমেশচন্দ্র মজুমদারের নাম। আন্তর্জাতিক মানের বেশ কিছু সাহিত্য কর্মের কথা তখন আর মনে আসে না। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের এই কবিরাজ লেখকের বঞ্চনার ঘটনায় পাঠক হিসেবে নিজেদের ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়।

রমেশচন্দ্র সেনের জীবনের প্রথম পূর্বের মতই তাঁর শেষ পর্বও কাটে অসম্ভব জটিলতায়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তাঁকে ছেড়ে দিতে হয় আবাল্যের প্রিয় মুক্তারামবাবুর আবাস। উত্তর কলকাতার বরানগরের নীলমণি সরকার স্ট্রিটের ২৪ নম্বরে তাঁকে প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও গড়ে তুলতে হয় আর এক ভুবন। দীর্ঘদিনের অ্যানজাইনা আর চোখের পীড়ায় রমেশচন্দ্র তখন ভীষণভাবে ক্লান্ত। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন রাতে অ্যানজাইনার ব্যথাটা যেন অভিশাপের ডাক বয়ে আনে। মাত্র কিছুদিন আগেই চোখের ছানি কাটানো হয়েছে মেডিকেল কলেজের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ডাক্তারের কাছে। বাংলা ১৩৬৯ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ, (ইংরেজি ১ জুন, ১৯৬২) ৬৭ বছর ৯ মাস ৯ দিনের টুলো পণ্ডিত রমেশচন্দ্র সেন ঘুমিয়ে পড়েন চিরদিনের মতন। সারাজীবন দারিদ্র্য, বঞ্চনা আর হতাশার মধ্যে শেষ হয় বাংলা সাহিত্যের টুলো পণ্ডিত তথা কবিরাজ লেখক রমেশচন্দ্র সেনের জীবনের গল্প।

কলাবন্ত অমিয়নাথ সান্যাল ঃ জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ

শতদল সেন

শীতকালে কলকাতায় একসময় 'বিশেষ আকর্ষণ'-রূপে সঙ্গীত ও নৃত্যের জমজমাট আসর বসত। আমহার্স্ট স্ট্রিটের (বর্তমানের রাজা রামমোহন সরণিতে) নির্ভেজাল একটা সাহিত্য ও সঙ্গীতের জমজমাট আড্ডাস্থল ছিল। আমহার্স্ট স্ট্রিটের ওপর বাঁ দিকে একটা ছোট গলি—নাম সুবল চন্দ্র লেন, সেই গলির মুখেই ডানদিকের দ্বিতীয় বাড়িটা ঘোষপাড়ার সতীমায়ের অন্যতম বংশধর পালদের সেই মাঝারি বাড়িতেই ভারতের তাবড় তাবড় ওস্তাদদের আনাগোনা ছিল একসময়।

সে সময় শীতের কলকাতায় মানুষজন মসগুল থাকতো বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন, তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন, ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স, ভবানী পুর সঙ্গীত সম্মেলন নিয়ে। তারই সঙ্গে একটি পারিবারিক প্রচেষ্টায় এক আন্তরিক ঘরোয়া পরিবেশে, উদার নান্দনিক আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আসতেন সারা ভারতের সঙ্গীত সাধকেরা, নৃত্যশিল্পীরা। শ্রেষ্ঠ কলাকার, কলাবন্তদের সমাবেশে মুখর হয়ে উঠতো পাল-বাড়ির অঙ্গন।

সেখানেই প্রথম দেখা ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলির আলিঙ্গনে আবদ্ধ এক বাঙালি ভদ্রলোককে। শুনলাম, ইনিই বাংলার অন্যতম গর্ব অমিয়নাথ সান্যাল এক অনন্য সুরসাধক, কিন্তু ভীষণভাবে প্রচারবিমুখ। সেদিনের আসরে অমিয়নাথ অংশ গ্রহণ করলেন না। খানিকক্ষণ থেকে দবীর খাঁ সাহেব এসে পেঁৗছানোর পর চলে গেলেন। দবীর খাঁর সঙ্গে একান্তে তাঁকে কিছু আলোচনা করতে দেখলাম।

অমিয়নাথ কৃষ্ণনগরের মানুষ। সান্যাল পরিবারের শাখা-প্রশাখার বিস্তার কৃষ্ণনগরের হাই স্ট্রিট জুড়ে। আমারও এই প্রাচীন জনপদটির সঙ্গে যোগসূত্র দীর্ঘকালের। বাল্য, কৈশোর, যৌবনের মায়াময়, স্বপ্নভরা অনেক স্মরণীয় দিন, অনেক বরণীয় মানুষকে দেখে কেটেছে। কিন্তু, তাঁদের মধ্যে অমিয়নাথ নেই।

স্থানীয় মানুষজন সুরসাধক অমিয়নাথকে ততটা চেনে না, যতটা চেনে

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার পাঁচুবাবুকে। আবার, কেউ কেউ বলে,—"পাঁচু ডাক্তারের যা মেজাজ।"

কিন্তু অভিজাত কৃষ্ণনাগরিকদের মধ্যে অমিয়নাথ এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গোয়াড়ী অঞ্চলের 'রায় সাহেব,' উকিল নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সল্ট্ কমিশনার চ্যাটার্জি সাহেব (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব), বউবাজারের খানদানি আকবর সাহেব, 'গুপ্ত নিবাসের' অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত (প্রখ্যাত উমেশ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র) রায় পাড়ার প্রাচীন রায় পরিবারবর্গ, সকলের কাছেই অমিয়নাথ শ্রদ্ধেয়, বরেণ্য, এক "দূরের মানুষ"। অকারণ কোলাহল, উৎসবের মত্ততা, আন্তরিকতাহীন সৌজন্য প্রকাশকে এই মানুষটি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না। তাই কোনও অনুষ্ঠানে তাঁর বিরল উপস্থিতি।

অমিয়নাথের যৌবনের 'আগুন জ্বালা' বেলার কিছু কথা শুনেছিলাম নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ভগ্নীপতি কৃষ্ণনগরের অন্যতম প্রবীণ মানুষ, ডাঃ শম্ভু লাহিড়ির কাছে। তাঁদের কালের কৃষ্ণনগর ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন স্মরণীয় কিছু মানুষ। সেসময় নদীয়ার বৈষ্ণব ধর্মস্রোত প্রবাহিত সর্বত্র। মানুষজন অন্য ভাবনার অনুসারী। রাজনীতির ঘৃণ্য রূপ তখন সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দেয়নি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর কলঙ্কিত হয়নি, ভারত তথা বঙ্গবিভাগের জঘন্যতম কলঙ্কে। এই প্রাচীন শহরটি তখন হয়ে ওঠেনি চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্য।

সেকালের কৃষ্ণনাগরিকরা শান্ত জীবন যাপন করতেন তাঁদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও সুস্থ জীবনের অন্য উপাদান নিয়ে। সুস্বাস্থ্য, সুআহার ছিল গৃহস্থদের সহজ দাবি, কাম্য। সস্তায় ভাল বলে, সুগন্ধী সোনা মুগের ডাল, খাঁটি গাওয়া ঘি, সুস্বাদু মাছ, আম, লিচু, কাঁঠাল, মর্তমান কলা আর বিখ্যাত সরপুরিয়া, সরভাজা, নিখুঁতি, সেই সঙ্গে বড বড কদমা, যা দেখতে বড, কিন্তু মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়, এসব সহজলভ্য ছিল।

সেই 'স্বর্ণযুগে' অমিয়নাথ ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ে গঠিত এক যুবক, যাঁর চরিত্রে কুসুম কোমলতার সঙ্গে বজ্রকঠোর সংকল্পের মেলবন্ধন ঘটেছিল। একদিকে কলাবন্ত, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী, অন্যদিকে স্বল্প সংলাপপ্রিয়, নিষ্ঠাবান, আপন কর্মে নিবিষ্ট, ভোজনপ্রিয়, মিতাচারী, জাতীয়তাবোধসম্পন্ন, আপোসহীন।

বিপ্লববাদের যুগে শহর কলকাতায় উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে মাঝে মাঝে বিশেষ

ব্যক্তিদের আড্ডায় দেখা যেত অমিয়নাথকে. সঙ্গে থাকত বিশেষ কোনও মিষ্টান্ন। সেই আড্ডাগুলিতে শুধুমাত্র মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য অমিয়নাথ যেতেন না। প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষে সমর্থনের একটা আভাস ছিল তাঁর আচরণে।

কিন্তু পরবর্তীকালে বিপ্লববাদের রূপ তাঁকে নিরাশ করেছিল। পরিণত-কালে কলকাতায় তাঁর আড্ডাস্থল পাইকপাড়া, পটলডাঙা, কখনও কখনও কৈলাস বোস স্ট্রিটে, তাঁর একান্ত বন্ধুজনের কাছে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নৈরাশ্যপীড়িত কিন্তু একান্ত সীমাবদ্ধ ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

অ্যালোপ্যাথিকে মাধ্যম করে যে মানুষটির হওয়া উচিত ছিল লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুচিকিৎসক, কালের অমোঘ বিধানে তিনি হয়ে উঠলেন সুরসাধক। জীবিকা নয়, জীবন সন্ধানী অমিয়নাথ জীবনের সুর সন্ধানে সারা ভারত পরিক্রমা করেছেন বিখ্যাত সঙ্গীত গুরুদের সাধনার রূপ-রস উপলব্ধি করতে, আহরণ করতে মার্গসঙ্গীতের অতুল বৈভবের কিছু কণা।

ওস্তাদ হতে গিয়ে ওস্তাদির মারপ্যাঁচ নিয়ে মাথা ঘামান নি অমিয়নাথ। যিনি নিজেই হয়ে উঠতে পারতেন একটি প্রতিষ্ঠান, বাংলার এক কিংবদন্তী সুরগুরু, তিনি অনায়াস ঔদাসিন্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন সীমাবদ্ধতার মধ্যে, কয়েক-জন মাত্র একান্ত স্বজন ও তাঁর দুই অসাধারণ সৌন্দর্য ও কণ্ঠের অধিকারিণী কন্যার মধ্যে বিমূর্ত করে তুললেন তাঁর সুর সাধনা ও সঙ্গীত বৈভবের কিছু অংশমাত্র।

শুনেছিলাম, লখনৌয়ের মরিস কলেজের কোনও এক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সুদীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে তান-লয় সহযোগে মার্গ সঙ্গীতের আলোচনা চালিয়েছিলেন অমিয়নাথ। ওঙ্কারনাথের চোখ হয়ে উঠেছিল অশ্রু-সজল, আবেগ ভরা গলায় বলেছিলেন,—"মানুষের জীবনের মধ্যেই আছে সঙ্গীতের বীজমন্ত্র, সাধনার দ্বারা তাকে উজ্জীবিত করতে হয়। তুমি এক মহান সাধক, তুমি তা পেরেছ, তোমাকে প্রণাম।"

'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' বলতে যা বোঝায়, অমিয়নাথের জীবনে তার সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত।—যতই তাঁর বয়স বেড়েছে ততই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে শুরু করেছেন তাঁর গৃহের পরিসরে, বন্ধুজনের নাগালের বাইরে। অ্যালোপ্যাথির তকমা এম বি) নিয়েও জীবিকার প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে তিনি হয়ে উঠলেন একজন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক, ধীরে ধীরে সংকুচিত করলেন নিজের পরিচয়ের

গন্ডী, অভ্যাগতদের আগমন হয়ে উঠল অপছন্দ।—অমিয়নাথের জীবনের এই পরিবর্তনের নেপথ্য ইতিহাস জানতে ইচ্ছে করে।

ষাটের দশকের প্রথম দিকে ডাঃ শম্ভু লাহিড়ি মহাশয়ের বাড়িতে সুরের জাদুকর অমিয়নাথ সান্যালের গান শোনার সুযোগ হয়। উপলক্ষ ছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জন্মদিন স্মরণ। কিছুদিন আগে—৩০শে জুন ১৯৫৯ লোকান্তরিত হয়েছেন মহানট। কৃষ্ণনগরে 'লাহিড়ী ভবনে' শিশিরকুমার যে ঘরে এসে থাকতেন, যেখানে অতীতে নাট্যাচার্যকে ঘিরে বসত জমাট সাংস্কৃতিক আসর 'ভাদুড়ী মশাইয়ের' অনুরোধে যেখানে অমিয়নাথ গান গেয়েছেন, সেই ঘরেই ছোট ঘরোয়া পরিবেশে কয়েকজন প্রবীণ ও আমাদের মত কয়েকজন নবীনকে নিয়ে আসরের ব্যবস্থা।

অমিয়নাথ এসেই একটি ফুলের স্তবক রাখলেন শিশিরকুমারের ছবির সামনে। বেশ কিছুক্ষণ প্রণাম জানিয়ে বসলেন শম্ভুবাবুর পাশে। শিশির ভগ্নী গৌরীদেবী এসে প্রণাম করতে অমিয়নাথ বললেন,—"খাঁটি বাঙালি খুব কমই দেখেছি। ভাদুড়ী মশাই ছিলেন একজন নিখাদ, খাঁটি বাঙালি।"

এক কাপ চা খেয়ে এক টিপ নস্য নিয়ে তাঁর তৎকালীন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বীরুবাবুর সঙ্গে দু'একটি কথা বলে, প্রবীণ তবলচির দিকে ইঙ্গিত করে শুরু করলেন সুর সাধনা।

নিমেষের মধ্যে ঘরের পরিবেশ বদলে গেল। সামনে বড় রাস্তা হাই স্ট্রিটের গাড়ির আওয়াজ আর শুনতে পেলাম না। জন কোলাহল নেই, সুরকল্লোলে মাঝারি ঘরখানি যেন গন্ধর্ব-সভার বিস্তার পেয়েছে। ভারতবরেণ্য ওস্তাদ কালে খাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য মুদিত নয়নে কিন্নর কণ্ঠে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সুরের সম্মোহন—

'—এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর
তেরো চরণো পর শির পরৈ"···

দুটি ভজন গাইলেন অমিয়নাথ প্রথমে! তারপর তুলে নিলেন তানপুরা। যন্ত্রটিকে বন্দনা করে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন মিনিট কয়েক। তারপর তানপুরায় তান উঠল, ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল গমক, 'ওঙ্কার' ধ্বনির মূর্ছনা,—নিমীলিত আঁখি সঙ্গীত সাধক গেয়ে উঠলেন,—

"গুজর গ'ই রাতিয়া
ছল মেরে ব'তিয়া··

"শ্যামলিয়া, তেঁই তো মন লিবু রে
তেবে শ্যামলী সুবত প'র মন লোভা ওযে।"

মনে আছে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম একটা ঘোবের মধ্যে। আকাশ ভরা জ্যোৎস্নায এ. ভি. স্কুলের সামনে দিযে মিশন বাড়ি পার হয়ে কুচিপোতাব মাঠেব ধাবে বিবশ হযে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। একটু দূবেই নেদেব পাড়ায় আমাব বাড়ি। অথচ একটা বিচিত্র অনুভূতিতে আমি বিবশ,—জ্যোৎস্নাব মধ্য দিযে যেন অমিয়নাথেব সুবেব ঝবনাধারা নেমে আসছে,—মিলিত হচ্ছে আমার মনেব মাঝে অনুবণিত সুবেব সঙ্গে।

বাড়ি ফিরে খাওযা সেবে একটা আকুতি অনুভূত হল। আমাব মন—ডুবুরি ডুব দিতে চাইছে, "স্মৃতিব অতলে" অমিয়নাথেব অবিস্মবণীয গ্রন্থে। পড়তে পড়তে সত্যিই তলিযে গেলাম সুবসাধকেব জীবনসঙ্গীতেব মধ্যে। শিহবণ জাগে এমন সব নাম। বাদল খাঁ, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, কালে খাঁ, কবিম খাঁ, দবীব খাঁ, ওস্তাদ কিষেণলাল, আবও কত সঙ্গীত জগতেব দিকপাল। সেইসঙ্গে নিজস্ব উপলব্ধ জ্ঞানকে বিশ্লেষণেব প্রযাস।

১৯৭১ সালে নকশাল আন্দোলনের অস্থিবতা কৃষ্ণনগব শহবকে গ্রাস করে। তাবই মধ্যে একদিন গেলাম অমিয়নাথের কাছে আমাব দিদি বিখ্যাত গায়িকা নযনাদেবীব দূত হযে। লংম্যানস্ গ্রীন ১৯৪৯ সালে অমিযনাথেব বিখ্যাত বই 'Ragas And Ragınıs' প্রকাশ কবে। তাবই প্রথম বইটি সংগ্রহ কবেন নযনা দেবী। যেহেতু তিনি দিল্লীর বাসিন্দা, অমিয়নাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওযা সহজসাধ্য নয।

সেবাব কলকাতায গাইতে এসে আমাকে অনুরোধ জানালেন বইটিতে অমিয়নাথেব অটোগ্রাফ্ এনে দিতে। গেলাম কৃষ্ণনগরে। পেঁৗছলাম বিকেলে। শহবেব আবহাওযা থমথমে। আমাব আত্মীযবর্গ অবাক। প্রশ্ন—এমন সময! পবিস্থিতি বড জটিল। একটু বিশ্রাম করে চা খেযে চললাম অমিযনাথেব বাড়ি। যানবাহন দুর্লভ। একজন পবিচিত পুলিশ অফিসাব তাঁব জিপ গাড়িতে আমাকে পেঁৗছে দিলেন হাইস্ট্রিটেব সান্যাল বাড়ি।

প্রথমটা অমিযনাথ আমাকে দেখে হতচকিত। দেখলাম বয়সেব ছাপ পড়ছে। ভুবু কুঁচকে থেমে থেমে বললেন,—"সন্ধে হয়েছে, চাবদিকে গণ্ডগোল, এমন সময় কেউ বাইবে বেরোয। প্রযোজনটা কি আমাব সঙ্গে?"

নযনা দেবী শ্রদ্ধা জানিযে একটি চিঠি দিয়েছিলেন অমিযনাথকে। তাঁর

হাতে সেটা দিলাম। বেঞ্চিতে বসে বসে দেখছি পুরু কাঁচের চশমা পরে অমিয়নাথ চিঠিটা পড়ছেন।

মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন যখন পেছনে তাঁর এক কন্যা,—প্লেটে দুটি কাঁচাগোল্লা আর সিঙ্গাড়া নিয়ে এলেন।—"এটুকু খেয়ে নাও। বইটা দাও, সইটা করি। আমি কি এমন লোক উনি আমার সই চাইলেন ?"

Ragas And Raginis দিলাম ওঁর হাতে। বিশেষ যত্নে, পার্চমেন্ট পেপারে মুড়ে রেখেছেন নয়না দেবী। মলাটে বীণাহস্তে মহাশ্বেতার অপূর্ব ছবি। মনে হল বইটির রক্ষণাবেক্ষণে সন্তুষ্ট অমিয়নাথ। সইটা ক'রে দিলেন।

প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছি, অমিয়নাথ আমার হাতটা ধরলেন। ঘরের বাইরে এসে সামনে দাঁড়ানো এক রিকশাওলাকে নির্দেশ দিলেন আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। জানালেন ওই রিকশাওলা গুরুতর সিরোসিস অব্ লিভারের রুগি, ওনার চিকিৎসা ওকে প্রায় মৃত্যু মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। কথার মধ্যে কোনও অহংবোধের প্রকাশ নেই। একটা সমভাব ছোঁয়া রয়েছে যেন।

'৭৭ সালের মাঝামাঝি তাঁকে শেষ বারের মত দেখা ও শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেলাম। তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে গৃহাবদ্ধ। দেখাসাক্ষাৎ পছন্দ করছেন না। তবুও আমার সৌভাগ্য, আমাকে ফিরিয়ে দেননি—সামান্য ২/৪টি কথার আদান-প্রদান হয়েছিল।

১৯৭৮ সালে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা সঙ্গীত জগতের অধিরাজ নিঃশব্দে বিদায় নিলেন নরজগৎ থেকে। সঙ্গীতপ্রেমী বাঙালির হৃদয়ে কতটুকু বিষাদের ছায়া সেদিন পড়েছিল?

।। কথোপকথন ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী ।।

সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সুমিত শোনু ?

শেষ অব্দি কে কে এলো বলতো ? দীপেন-শক্তির কথা ছাড়। ওরা তো আগেই কেটে পড়েছে। সবচেয়ে সরু রজনীগন্ধার মালা নিয়ে আসবে সন্দীপন সে তো আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ! দেবেশ অরুণ দেবপ্রিয় স্বপ্না জ্যোতি মালবিকা শঙ্খ ওঁরা তো থাকবেনই।

সু ঃ আপনি মরার পর কে কে বিবৃতি দেবে বলে আপনার ধারণা ?

পু ঃ বুদ্ধ একটা আন্তরিক বিবৃতি দেবে আমি জানি—

সু ঃ জ্যোতিবাবু ?

পু ঃ জ্যোতিবাবু ! doubtful case—

সু ঃ কেন ?

পু ঃ কারণ-শোনু-পূর্ণেন্দু বললেই জ্যোতিবাবুরপ্রথম মনে পড়বে airport-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের protocol offier পূর্ণেন্দু ঘোষের কথা। অবসরের পর তিনি নাকি তেইশবার extension পেয়েছেন। যোগ্যতার জন্যই পেয়েছেন। Bachelor মানুষ।

রাত তিনটেয় ভেনিজুয়েলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী যদি দমদম-এ নামে দেখবি ফুলের তোড়া হাতে পূর্ণেন্দু ঠিক হাজির। তারপর জ্যোতিবাবুর মনে পড়বে পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি'র কথা—সেই আমেরিকায় ব্যবসা করে—এখন যেন হলদিয়ায় কী সব করছে—এসব কাটিয়ে বুদ্ধ যদি বুঝিয়ে উঠতে পারে যে আমি কে—তাহলে হয়তো শিকে ছিড়বে।

সু ঃ শিকে তো ছিড়েছে।

পু ঃ বলিস কী !

সু ঃ আচ্ছা কংগ্রেসের কেউ—

পু ঃ না না ওদের অতো সময় নেই। তাছাড়া সোমেন বিবৃতি দিলে এক মানে —মমতা দিলে আবার অন্য। মরার পরে আর ওসব ঝামেলায় জড়াতে চাই না। তবে প্রণববাবু হয়তো একটা বিবৃতি দিলেও দিতে পারেন।

সু : এর বাইরে অন্য কেউ ?

পু : না—তাহলে বুঝতে হবে আমার dead body ভাঙিয়ে বেতার-টি ভি-খবরের কাগজে নিজের নামটা ঝালিয়ে নেবার মতলব।

সু : আমি কী করব ?

পু : টিভি-তে আমাকে নিয়ে সচিত্র সংবাদ যাবে। সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে ধর এখনই দেশের কোথাও এমন এক ইন্দ্রপতন ঘটল যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় পতাকা অর্ধনমিত। তখন দেখা যাবে তুই নিখোঁজ। আমার ছেলে, হয়তো ফোন-এ তোকে ধরল—তুই জবাব দিবি পরে কথা হবে ভাই। মনে মনে বলবি রাষ্ট্রীয় শ্রাদ্ধ আগে না পূর্ণেন্দু পত্রী। আসলে দেখলাম মরার পরেও priority-র প্রশ্নে একটা class struggle থেকেই যায়।

সু : অন্য একটা কথা—

পু : আরে তুই তো আমার প্রথম কথারই জবাব দিলি না—আচ্ছা সুনীল এসেছিল ?

সু : সুনীলদা কলকাতার বাইরে ছিলেন।

পু : সুনীল থাকলে ঠিকই আসত। কিন্তু আর কে কে কলকাতার বাইরে থাকার অজুহাত দেখাচ্ছে—সেটা বুদ্ধকে বলে পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করিয়ে নামগুলো টি ভি-তে এখনই flash কর। এ কেমন কথা। থেকে বলবে নেই। অথচ officially আমাকে boycott ও করছে না।

সু : অনেকেই তো এসেছিলেন-মৃণাল সেন, মাধবী মুখার্জি, কুমার রায়, বিজন চৌধুরী, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশবাবু—কে নয় !

পু : আচ্ছা নিমাই কে দেখলি ?

সু : এই তো মুশকিল করলেন। 'পূর্ণেন্দু' বললে জ্যোতিবাবু যতটা confused হন 'নিমাই' বললে আমিও ঠিক ততটাই—

পু : আরে ধ্যাত্—বাগনানের নিমাই নিতাই জ্যোতি চক্রবর্তী নিরুপমা—

সু : ও নিমাই শূর। হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি আর ছন্দা চ্যাটার্জি তো ঘাট অবধি হাজির ছিলেন—

পু : এই নিমাই আমাকে কম চিমটি কেটেছে ?

সু : কী রকম—

পূ : বলতো সারা জীবন নিজেকে creative বলে জাহির করে মাঝ পথে কেন মাস মাইনের খাতায নাম লেখাতে গেলি ?

সু : সে আপনাকে ভালবেসে—

পূ : কিন্তু ও বলার কে ? ও নিজেই তো যাত্রার দল খুলে একগাদা লোককে মাস মাইনে দিয়ে পুষত।

সু : তাদের থেকে নিশ্চযই আপনাকে আলাদা ভাবে—

পূ : না—ভালবাসে-সেটা ঠিক। আসলে ওদের সঙ্গেই তো আমার জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর দেশভাগের অবসানে ক্লান্ত বিষণ্ণ চরাচর। তবু সেই ভযের অন্ধকারে বরাভয দেন রবীন্দ্রনাথ ঃ "আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" আমরা তখন সেই নতুন জযযাত্রার তীর্থ পথিক। স্তালিনের মুখ চেয়ে তিন লক্ষ সোভিযেত নাগরিক প্রাণ দিযে নির্মূল করেছে হিটলারকে। জগৎ জুড়ে তখন পদানত জনতার তা তা থৈ থৈ। নাকোল, ডুবির ভেডি, বড়া কমলাপুরেও পৌঁছে গেছে সেই মনমোহিনী ছন্দের রেল।

সু : কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বর হযেছিলেন ?

পূ : না। বরাবরই হাঁপানি ছিল। আর আমি দেখেছি পার্টির-মেম্বরদের মিটিং মানেই সব দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতরে থাকলে নির্ঘাত অক্সিজেনের অভাব বোধ করতাম। তাছাড়া এও ভেবেছি—ধর যে নারীর বেণীবন্ধন, আযত চোখ আর লাজুক ওষ্ঠ আমাকে মুগ্ধ করেছে তার হৃদপিন্ড আর পাকস্থলীর anatomy জেনে আমার হবেটা কি ?

সু : এতো দেখছি শুধুই illusion—

পূ : আমি তো illusion দিযেই reality তৈরি করি ! এই যেমন দ্যাখ আমার নামের আদ্যক্ষর 'পূ'—সেটা আমি সারা জীবন 'ছ' দিযেই সারলাম। কেউ তো আপত্তি করেনি।

যাকগে ছাড় ওসব। ওই নারীর কথা বলতেই মনে পড়ল—

সু : হ্যাঁ আপনিই তো লিখেছিলেন 'ফুলের গন্ধে ফোটার জন্যে / নারীর স্পর্শ পাবার জন্যে'—

পূ : এই থাম। এখন নিজের কবিতা একদম ভাল লাগছে না। যা বলছিলাম—উত্তমকুমার মারা যাবার পর দেখেছি কাতারে কাতারে মহিলা

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি অবশ্য তেমন কপাল করে জন্মাইনি। তবু—

সু: না না ছিল। রবীন্দ্রসদনে আপনার অনুরাগী মহিলার সংখ্যা ঈর্ষণীয় না হলেও নিতান্ত কম নয়। আচ্ছা একটা কথা—আপনার মৃত্যুতে কেউ কি খুশি হবে?

পূ: তেমন কাউকে তো দেখছি না। তবে প্রকাশটাকে নিয়ে ভয় আছে—ফস্ করে কিছু বলে দিতে পারে। কারণ বিজনদা-র 'গয়েনি'কা'র নিচে বসে আমি আঁকার ক্লাশ নিতাম বলে ওর বরাবরই একটা গাত্রদাহ ছিল!

সু: আপনি তাহলে সত্যিই আমাদের ছেড়ে চললেন?

পূ: ছেষট্টি বছরে চলে যাচ্ছি—অকালপ্রয়াণই বলব—তবে ৯৬ বছরে গেলেও, অকালপ্রয়াণই হত। তখনও দেখতিস নির্ঘাৎ কোন প্রবন্ধ, কোন Cover কোন proof অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আসলে যে সব ফেঁদে বসেছিলাম তা তিন জীবনেও শেষ হবার নয়। আমি তো এখন ঝাড়া হাত-পা। যা করে যেতে পারলাম না—তার অভাব তো পোয়াতে হবে তোদের।

আসলে এখন আমার সমস্যা একটাই। কলকাতা ছেড়ে তো থাকতে পারি না। এখন এই অগুনতি negative-এর ভিড়ে খুঁজে বার করতে হবে রাধারমণ মিত্র আর নিশীথরঞ্জন রায়কে। দেখি কলকাতা নিয়ে একটা কেত্তনের দল খোলা যায় কিনা। থণ্ডকম্পন সাহেব আর শার্টুলবাবুরা কবে রণে ভঙ্গ দেবেন কে জানে!

সু: খুব ব্যক্তিগত অভাব বোধ করছি।

পূ: ও সব ছাড়। পৃথিবীতে কারুর জন্য কিছু আটকায় না। আর তুই তো মাঝে মধ্যে ওই lettering করাতে আসতিস।

সু: কিন্তু পারিশ্রমিক দিয়ে—

পূ: হ্যাঁ—তা দিতিস। তাও তোর প্রথম কাজ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে documentay—সে কাজ বিনে পয়সায় করে দিয়েছি তুই সবে লাইনে নেমেছিস বলে। পরের টাকাও দিতিস কিনা জানি না। আসলে তুই কোন কাজ নিয়ে এলেই তোর মামা মণি মুখোপাধ্যায়ের কথা তুলে তোকে একটু চাপের মধ্যে রাখতাম। আসলে মণি আজ অবধি যত cover করিয়েছে সবই অনাবিল হাসির বিনিময়ে। সি পি এম-এর সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'নন্দন'-এর প্রথম প্রচ্ছদ আমিই

এঁকেছি মণি-র কথাতে। আজকের প্রজন্ম হয়তো সে খবরও রাখে না।

সু ঃ আপনার কি কোন অভিমান আছে ?

পূ ঃ সে এসব কাজ যারা করে তাদের একটু আধটু থাকে। তবে আমার সমস্যাটা হচ্ছে ক্রিকেট মাঠের all rounder-এর সমস্যা। all rounder-রা কখনও তারকা হতে পারে না। তাদের কাজ হচ্ছে শূন্য স্থান পূরণ করা। প্রতিপক্ষের batsman হয়তো রত্নাকর হয়ে মাঠে ঢুকে বাল্মীকী হয়ে উইকেটে সেঁটে গেছে—যাও বাপু all rounder পিটিয়ে-পাটিয়ে ওকে হটাও। নিজের দলের star batsman রসগোল্লা হাতে নিয়ে pavllion-এ ফিরে আসছে—দলপতি বলবে যাও all rounder innings-এর ইমারত গড়ে তোলো। fielding-এর ছেঁড়া জাল দিয়ে বল গলে গলে Score Board ফুলে ফেঁপে উঠছে—all rounder তুমি body ফেলো। তাল-তমাল হতে পারলাম না। হয়ে পড়েছি সপ্তশাখ কৃষ্ণচূড়া !

সু ঃ বিশেষ কারুর কথা মনে পড়ছে ?

পূ ঃ হ্যাঁ যাবার আগে অন্ততঃ তিনজনকে নতজানু হয়ে প্রণাম করে যাব। পিতা পুলিনবিহারী—সময়ের সঙ্গে পাঞ্জা কষে যিনি প্রমাণ করেছেন যে বেঁচে থাকাটা কোন সমস্যাই নয়। আমার জন্যে তাঁর কী বিড়ম্বনা ! এমন শোকে আমি নিশ্চিত উন্মাদ হয়ে যেতাম।

তারপর কাকা নিকুঞ্জবিহারী—আঁধার গলি থেকে যিনি আমাকে আলোর রাজপথে নিয়ে এসেছেন। মধ্যপুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছেন-সাঁতরে ডাঙায় ওঠ্—আমি তো আছি।

আর উমা। আমার সময়ের সঙ্গে বরাবর আমার যে অসম সংগ্রাম—তার সব নির্মম সংহারের কালশিটে সে অবলীলায় ধারণ করেছে।

তোর-আমার মধ্যেকার বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। কথায় কথা বাড়ে। নিজের চোখের সামনেই নিজের পৃথিবী কেমন করে শেষ হয়ে যায়। টি এস এলিয়টের 'waste land'-এর ওপর এজরা পাউণ্ড যতই কলম চালান—সেই মোক্ষম লাইনটাই আজ আমার মনে পড়ছে :

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends

Not with a bang

But with a whimper.

সু : আমিও ধার করেই আপনাকে শেষ নমস্কার জানাই :

কিছু বা যায় না মোছা

সুবর্ণের লিপি—

ধ্রুবতারকার পাশে

জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।

সাফাই : 'পরিচয়'-এর এই সংখ্যায় আমিই হব সবচেয়ে অনামী লেখক। যে দুঃসাহসে লিখতে বসা তার কারণ বিগত তিন দশক তাঁর সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। কোন আবদার উপেক্ষিত হয়নি বলে প্রশ্রয় একটু বেশিই পেয়েছি। 'ফেড ইন-ফেড আউট'বইখানা উৎসর্গ করেছেন আমাকে। সেখানেও তাঁর উদ্দাম কৌতুকের অমল স্পর্শ : 'সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে—যে এক সময় সিনেমাকে ভালবাসতো—এখন ভালবাসে শুধু টি ভি-কে' লেখার তারিখ ৫ই এপ্রিল '৯৭—যেদিন 'নন্দন'-এ তাঁর স্মরণ সভা ছিল।

গঠনকৌশল

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

বেলার দিকে আজ রোদ উঠেছিল। মনে হয়েছিল ভিজে ভিজে ভারি হয়ে যাওযা আকাশটা বোধ হয় এবার একটু শুকিয়ে নেবে। কিন্তু দুপুর থেকে আবার মেঘ করে এল। আর ঠিক বেরনোব মুখে মুখে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি। কদিন ধবেই আকাশ মেঘলা হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে হযেও যাচ্ছে কয়েক পশলা। শ্রাবণের আকাশ। এরকমই হওয়াব কথা। তবু সুভদ্রা ভেবেছিলেন ভালয় ভালয় বেরিয়ে পড়তে পারবেন। যা ভাবা যায় তা কি আর সব সময়ে হয়ে ওঠে? সংসারেব উনকোটি চৌষট্টি রকম কাজ যেন পাযে পা জড়িয়ে থাকে। বড নাতি ইস্কুল থেকে ফিবে কী খাবে তার ব্যবস্থা করা, তার আবার ঠামুর হাতে ছাড়া খাবার পছন্দ হয় না। ছেলেরা অফিস থেকে ফিবে কী জলখাবার খাবে সবিতাকে বুঝিযে দেওয়া। বড় বৌমার ইস্কুলেব চাকবি। সকালেব ইস্কুল। অনেক সকালে উঠতে হয। তাই, দুপুর বেলাটা ছেলে ইস্কুল থেকে ফেবাব আগে পর্যন্ত তাব ঘবের দবজা-জানলা বন্ধ কবে টানা ঘুম দেয়। ছেলে বাডি ঢুবতে ঢুকতে ধুন্দুমার কাণ্ড বাধায়। জুতো-মোজা-জামা-ব্যাগ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে এখানে-সেখানে! তখন আব কারুর বিশ্রাম-টিশ্রাম নেওযাব উপায থাকে না। ছোট বৌমা গান নিযে পডাশুনো কবে। সে সাড়ে দশটা নাগাদ ইউনিভার্সিটি চলে যায। ফিরতে ফিবতে সন্ধে। তাব ন-মাসের মেযেটা আযাব কাছে থাকলেও তদারকি করতে হয় সুভদ্রাকেই। বাচ্চাটাও হয়েছে তেমন। সুভদ্রাকে দেখলেই হল। যার কোলেই থাকুক ভুবন-ভোলানো হাসি দিযে একেবারে দু-হাত বাডিয়ে ঝুঁকে পডবে। এইসব সামলে ঘর-দোর ফিটফাট কবিযে বসার ঘরটি সাজিয়ে গুছিয়ে বেরনো। তাব ওপব এখন বর্ষাকাল। সব ঘরের দরজা-জানলা দেখে শুনে বন্ধ কবে না বেবলে কখন ছাঁট এসে বিছানা-বালিশ ভিজিয়ে দেবে তাব ঠিক নেই। একতলা দোতলা মিলিয়ে এগারোখানা ঘর এ বাড়িতে। নিচেব তলাটা প্রায় বন্ধই থাকে আজকাল। মুন্নি থাকতে সে নিচে পডাশুনো করত। তার বন্ধু-বান্ধব আসত যেত। হই হই, আড্ডা, গান বাজনা, নানান বিষয়ে তর্ক। বাড়িটা গমগম করত।

ফুটফুটিকে আদর করে ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে একতলায় নামতে যাবেন ঠিক সেই সময় ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বড় বৌমা। বেশ কিছুদিন ধরেই খেয়াল করছেন, তার এই বেরনো নিয়ে তার চারপাশে একটা নীরব নিষেধ ঘনিয়ে উঠছে। সরাসরি কেউ কিছু বলে না। সুভদ্রাও অবশ্য তেমন আমল দেন না। কেবল মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম অস্বস্তিতে ভোগেন। বড় বৌমার এই সময়ে ওঠার কথা নয়। একটু অবাক হলেন। বললেন 'উঠলে যে? টিকলুর আসার এখনও অনেক দেরি।' এই মেয়েটি এত সুন্দরী এখনও একে তাকিয়ে দেখেন সুভদ্রা। প্রায় তেরো চোদ্দ বছর বিয়ে হয়ে এসেছে। শ্রেয়াকে দেখে বোঝার উপায় নেই। ইদানীং একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে। তাতে যেন আরও বেশি ভাল লাগে। নিশ্চিন্ত সুখী সুখী চেহারা। আগে কোমর পর্যন্ত চুল ছিল। লম্বা বিনুনি করত। হাঁটা চলার তালে তালে সাপের মতো দুলত বেণীটা। তখনও ভাল লাগত। এখন হাল-ফ্যাশান অনুযায়ী চুল কেটে ছোট করে দিয়েছে। ক্ষেপা ক্ষেপা চুলগুলো ফর্সা মুখের চারপাশে ঝামড়ে পড়ে। এখনও ভাল লাগে। খুব বড় বড় টানা টানা চোখ, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট। কপালে একটা টিপ পরলেই মনে হয় অনেক সেজেছে। দুপুরে বিশ্রাম নেওয়ার ফলে মুখটা এখন ফোলা ফোলা। গলার স্বরটা ভার। এই অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর দিকে যত বারই তাকান তত বারই ছেলের পছন্দের তারিফ করেন মনে মনে। শ্রেয়া বলল, 'এই বৃষ্টির মধ্যে,...এখন কদিন নাই যেতেন।' সুভদ্রা ব্যাগের চেন আটকাতে আটকাতে মৃদুস্বরে বললেন—'না গেলে কী করে হবে?'

'আপনার ছেলে কাল রাগারাগি করছিল। বুম্বাও কাজরীকে বকাবকি করেছে।'

সুভদ্রা শ্রেয়ার কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারছিলেন না। কথাগুলো কুয়াশার মত আবছা লাগছিল তাঁর কাছে। বুম্বা তাঁর ছোট ছেলে। তার স্ত্রী কাহবী। তাঁর যাওয়ার সঙ্গে বুম্বার কাজরীকে বকাবকি করার প্রত্যক্ষ কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি টালমাটাল চোখে তাকালেন শ্রেয়ার দিকে। শ্রেয়ার গলায় সামান্য কুণ্ঠা। কথা বলতে গিয়ে সেটুকু কাটিয়ে উঠল—'ছেলেদের অভিযোগ 'আমরা আপনাকে ঠিকমত দেখি না। এই বর্ষাকাল। উত্তর থেকে দক্ষিণে এতটা যাতায়াত। একটা কিছু অঘটনের কথা কি বলা যায়?' স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সুভদ্রা। বুকের মধ্যে একটুখানি শিরশিরানি। তাঁর জন্য ছেলেরা এখনও এতটা ভাবে! বড় কষ্টের সংসার তাঁর। বড় দুঃখের ছেলেমেয়ে।

চোখ দুটো ঝাপসা হযে গেল। এই এক হযেছে আজকাল। সুঃখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো আগের মতো শক্ত হয়ে হজম করতে পারেন না। চোখ দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। গলা পরিস্কার করে বললেন—'মা কি কারও চিরকাল থাকে বৌমা। ওদের বোলো। তেষট্টি চলছে। আর কদ্দিন?' শ্রেয়া এবার খুব টান টান গলায় বলল—'একটা অন্য কোনও ব্যবস্থা করা যায় না?'

—অন্য ব্যবস্থা? সুভদ্রা সিঁড়ির রেলিংয়ে এক হাত রাখলেন।

—কোনও একজন লোক ঠিক করলেই তো হয়!

—হঠাৎ আজ এ কথা, সুভদ্রা শ্রেয়ার চোখে চোখ রাখলেন।

—সময় অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়। সব কিছুর একটা মানানসই আছে তো? শ্রেয়া সুভদ্রার চোখ থেকে চোখ সরাল না। চোখের দিকে তাকিয়েই বলল কথাগুলো।

সুভদ্রার সারা শরীরে রক্তকণারা দাপাদাপি করতে লাগল। তাঁর ফর্সা মুখে কালোর আভা। কান দুটো গরম হযে উঠল। বললেন,—'কিসের মানানসই বউমা? তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

শ্রেয়া এইবার ঢোক গিলল। সামান্য সময় চুপচাপ রইল এবং তারপর প্রায় মরিয়া হযে বলতে থাকল—'শুধু আমার কথা নয় মা, আর বোঝানোর কথাও নয়। কিন্তু কেউ যদি চোখ থাকতে অন্ধ হন···। মুন্নির শ্বশুরবাড়ি ও-পাড়ায়। ওরা নানা কথা লেখে মুন্নিকে। মুন্নি গত সপ্তাহে দুঃখ করে চিঠি লিখেছে ওর দাদাকে। লিখেছে শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখানো বন্ধ হয়ে যাবে ওর।'

সুভদ্রার উত্তেজনা এবার তাঁর আয়ত্তে থাকে না। বারান্দায় উঠে চেয়ার টেনে বসেন। তাঁর গলার স্বর চড়ে যায়। বলেন-'ওই চামারদের কথা শুনে মুন্নি দুঃখ করেছে? ও ওদের জানে না? বিয়ের সময় পণ দেওয়া হবে না জেনে বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করেনি? রাস্তা ঘাটে আমাদের কম অপমান করেছে? নেহাত ছেলেটি ভাল। কে সেদিন দাঁড়িয়ে থেকে অনিন্দ্যর পক্ষে সই করেছিল? কে সেদিন নিজের ঘাড়ে সব তুলে নিয়েছিল, মুন্নি ভুলে গেল? সবই তো জানো।'

শ্রেয়া খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সুভদ্রার কথাগুলো শুনছিল এবং ভেতরে ভেতরে গুছিয়ে নিচ্ছিল। তাই সুভদ্রার কথা শেষ হলে সে থেমে গেল না। বলল—'মানুষের মুখ তো জোর করে বন্ধ করা যায় না। সমাজে বাস করি যখন, কিছু

কিছু সামাজিকতা মানতেই হয়। আপনার ছেলের বস ওদিকে থাকেন। যাতায়াতের পথে আপনাকে দেখেন প্রায়ই। তিনিও বলেছেন, এই সময়ে একা একা উত্তর থেকে দক্ষিণে, কী এমন প্রয়োজন ?'

সুভদ্রার ভেতরটা পাক দিয়ে উঠছে অনেকক্ষণ ধরে। আজকাল উত্তেজনা হলে মাথা-টাথা ঘোরে। প্রেশারটা বেড়েছে বোধ হয়। অনেকদিন মাপা হয় না। সুভদ্রা খানিকটা অসহায় বোধ করেন। শ্রেয়ার দিকে তাকান,–'ওই মানুষটার সামান্য কোনও কাজে লাগতে পারা ভাগ্যের কথা। ওঁর কাছে আমাদের সবক্কালের ঋণের শেষ নেই। যে কদিন আছি, এইটুকু পুণ্যি কুড়োনো বন্ধ করতে পারব না।

শ্রেয়া প্রসঙ্গ থামিয়ে দেয়, 'দেখুন, যা ভাল বোঝেন।' আচমকাই ঘরে ঢুকে যায় সে। সুভদ্রা আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙেন। একতলায় মুন্নির ঘরের দিকে এখনও তাকাতে পারেন না। বুকটা ভারি হয়ে ওঠে। মেয়েটা যেন সূর্যের আলোর মতো ঝলমলে করে রাখত বাড়িটা। কতদিন দেখেন না। বছর ঘুরে এল। বাচ্চা-কাচ্চা হবে। এই সময় তিনি নিজে কাছে থাকলে · , নানান রকম আজে-বাজে চিন্তা হয়। যতবার লিখেছেন-'তুই চলে আয়,' ততবারই মেয়ে লিখেছে, 'এদেশে সব রকম ব্যবস্থা এত ভাল। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না। তা ছাড়া অনিন্দ্যকে তো জান। হি ইজ টু মাচ সিনসিয়ার অ্যান্ড কেয়ারিং।' চিঠি পড়ে হাসেন সুভদ্রা। প্রসূতি মায়ের ব্যাপারে অনিন্দ্য পুরুষ মানুষ, কত লক্ষ্য রাখবে। কী লক্ষ রাখতে হয় তাই তো সে জানে না। বুক খালি করে নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। মুন্নি তাঁর এত আদরের সন্তান। সে তাঁর দুঃখের কথা মা-কে জানাতে পারল না ? তার জন্য সে শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাতে পারছে না !

বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই কাজরীর সঙ্গে দেখা হল। উল্টোদিকের বাস থেকে নেমে সুভদ্রাকে দেখে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে এল। এই মেয়েটি বড় বউমার মতো সুন্দরী না হলেও কালোর ওপর ভারি ঢলঢলে চেহারা। একটা আলগা লাবণ্য আর মিষ্টতা মাখানো চোখে-মুখে। গায়ও ভাল। মুন্নির বন্ধু। ছোট থেকেই এ বাড়িতে আসত যেত। ওর মধ্য দিয়ে অনেক সময় মুন্নির সুবাস পান সুভদ্রা। কাজরী কাছে এল। সে বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষকেই নির্বিবাদে তুমি বলে। থাকেও একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো। মানিকতলায় বাপের বাড়ি।

কলেজ যাওয়া-আসার পথে দেখা টেখা করে যায়। থাকতে চায় না। কাজরী কাছে এল—'ওমা, তুমি যাচ্ছ?'

আকাশ এখন আরও কালো করে রয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছেই। ঠাণ্ডা হাওয়া। সুভদ্রা শাড়িব আঁচলটা গায়ে-জড়িয়ে নেন,—'হ্যাঁ। তুই এত তাড়াতাড়ি?' একে চেষ্টা করেও তুমি বলতে পারেন না সুভদ্রা। মানুষের ভালবাসা কেড়ে নেওয়ার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে ওর। কাজরী খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে। হড়বড় করে বলল,—'আকাশে যা মেঘ। শেষের দুটো ক্লাস কাটলাম।' একটু থামে। কী ভেবে নেয়। তারপর আগের সুরেই বলে, 'মা চলো আজ আমিও যাই তোমার সঙ্গে।'

সুভদ্রা প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন-'পাগল একেবারে। মেয়েটা কতক্ষণ মা ছাড়া রয়েছে বুম্বা এসে রাগারাগি করবে।

—তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

—তাহলেও রাত আটটা-সাড়ে আটটা বাজবে তো? আজ থাক। ছুটির দিন দেখে যাস।

দূরে শ্যামবাজার-গোল পার্ক মিনির মাথাটা দেখা যায়। রাস্তাঘাটে আজ লোকজন কম। স্ট্যান্ডও ফাঁকা। এই বাদলায় মানুষজন তেমন বেরয়নি। ফুটের ওপরের দোকানগুলোও ফাঁকা ফাঁকা। সুভদ্রা কয়েক পা সামনের দিকে এগোলেন। কাজরীও এল। খুব আস্তে বলল, 'আজ তাড়াতাড়ি ফিরো।'

তাকালেন সুভদ্রা,—'কেন রে? বুম্বা কাল বকাবকি করেছে বলে?'

চমকে উঠল কাজরী। বলল—'যে যাই বলুক, তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। তবু তাড়াতাড়ি ফিরো। তুমি না-আসা অবধি আমার চিন্তা হয়।'

বাস স্টপে দাঁড়িয়েছে। সুভদ্রা ছাতা বন্ধ করে বাসে উঠলেন। উল্টোদিকে যাচ্ছে বলে বেশ ফাঁকা। তার ওপর বাদলার দিন। সামনের দিকের সিটে বসলেন। কাজরী আস্তে আস্তে রাস্তা পার হয়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে।

বাস থেকে নেমে ডুপ্লিকেট চাবি বের করে দরজা খুলতে গিয়ে সুভদ্রা দেখলেন, ভেতর থেকে বন্ধ। বেল বাজালেন। দরজা খুলে দিলেন অনুনয়। সুভদ্রা অবাক হয়ে বললেন—'বেরওনি!' অনুনয় সরে এসে সুভদ্রাকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—'ভিজেছ তো? মাথা-টাথা আগে মোছো।' সুভদ্রা বললেন—'বাস স্ট্যান্ড থেকে এইটুকু আসতেই ছাঁট এসে লাগল।' অনুনয় সদর বন্ধ করলেন। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আজ যে রকম ওয়েদার,

ভাবলাম তোমার সঙ্গে হাতে হাতে খিচুড়ি বানানোতে হেল্প করি। তাই আব ইনস্টিটিউটে গেলাম না।' সুভদ্রা ভেতরে গেলেন। বলতে বলতে গেলেন—'তাব মানে আজ বাত্তিবের মেনু খিচুড়ি, এই তো ?' হাঃ হাঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন অনুনয। স্টাডি রুমে গেলেন। কম্পিউটাবে পেপার ঢোকানো ছিল। সুইচ অফ কবলেন। টেবিলের ওপব খোলা বইগুলো বন্ধ কবলেন।

এ বাড়িতে সুভদ্রাব জামা-কাপড় রাখা থাকে। তিনি একটা আটপেবে শাড়ি জড়িযে অনুনযের শোওযাব ঘরে এলেন। খোঁপাটা খুলে দিযেছেন। ভিজে চুলগুলো পিঠ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বয়সেও দেখবাব মতো চুল। তবে সাদা হযে এসেছে মাঝে মাঝে। অনুনযের গাযে একটা বেড কভার জড়ানো। সুদীর্ঘ স্বাস্থ্যবান শবীব। টিকালো নাক, লম্বাটে মুখ। টকটকে ফর্সা বং। মাথাব চুল সামনের দিকে পাতলা হয়ে এসেছে। এক মুখ সাদা দাড়ি। হাই পাওয়াবেব চশমা। চশমাব ভেতর দিয়েও দু-চোখ দিযে যেন আলো ঠিকরায়। তার চোখ দুটোই বলে দেয, এ পৃথিবীতে তিনি এসেছেন নির্দিষ্ট কিছু কাজ কবতে। তাঁর ঠোঁটে সব সময় একটা অস্পষ্ট হাসিব ইশাবা থাকে। দৃশ্যমান পৃথিবীব সমস্ত কিছুতেই যেন তিনি অদ্ভুত মজা পান। যা ঘটছে যা ঘটতে পাবে সবই যেন তাঁব আগে থাকতে জানা।

অনুনয় এখন বেড-কভাবটা গাযে জড়িয়ে খাটেব ওপর বেশ গুছিয়ে বসলেন। দক্ষিণ-পুব মুখী ঘর। পুবনো আমলের একতলা বাংলো গোছেব বাড়ি। সামনে পেছনে নানান গাছপালা। গেটে ঢোকার মুখে দু-পাশে দুই কৃষ্ণচূড়া ডালপালা ছড়িযে মাথা উঁচু কবে দাঁড়িযে। এ ছাড়া পেছন দিকে একটা কাঁঠাল গাছ, গোটা কযেক সুপুবি গাছ, দু-তিনটে পেঁপে গাছ। সামনেব জাযগা-টুকুতে সুভদ্রা বাগান করেছেন। বঙ্গন, গাঁদা, কলকে, জবা কিছু মবশুমি ফুলেব গাছ এই সব। বর্ষার জলে জলে গাছ-পালাগুলো থেকে ভিজে আর ভারি গন্ধ আসছে। বৃষ্টির বেগ মাঝে মাঝেই বাড়ছে কমছে। জানলা দিবে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। চেযাবে বসেছেন সুভদ্রা। আঙুল দিয়ে ভিজে চুলগুলো ছড়িযে দিচ্ছেন। অনুনয় সিগারেট ধবিযেছেন। সুভদ্রা গাযেব আঁচলটা টেনে দিলেন। শীত শীত কবছে। জিজ্ঞেস কবলেন—'বাড়িতে বইলে, সকালে কি খেলে ?'

অনুনয় কাশছেন। মুখ থেকে সিগাবেট নামালেন। বললেন—'রানু সকালে ক-খানা রুটি কবে দিয়েছিল। দুধ দিযে খেযে নিলাম।' জিজ্ঞেস

করলেন, 'রাস্তায জল জমেনি ?' সুভদ্রা জানলার বাইবে তাকিযেছিলেন। সেদিকে তাকিযেই উত্তব দিলেন—'জমেছে কোথাও কোথাও।'

'আসতে কষ্ট হল তো ? বাবণ কবলেও শুনবে না।' এইবাব ঝংকার দিযে উঠলেন সুভদ্রা—'তোমাদেব কী হয়েছে বলো তো ? সবাই মিলে এক সুরে গাইছ ?'

অনুনয সিগাবেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। ধোঁযাব রিংগুলো আস্তে আস্তে ভেঙে ছড়িযে মিশে গেল। বললেন,—'সবার কথা জানি না। আমি আমাব কথাই বলছি। আগেও বলেছি। দিন-দিন বযস হচ্ছে।'

সুভদ্রা গলার স্বব আবও চড়িয়ে দেন—'হ্যাঁ, আমার বয়স হচ্ছে আর তোমাব ? তুমি কচি খোকা ? এত যদি আমাব জন্য চিন্তা তবে সময থাকতে বিয়ে কবনি কেন ?'

অনুনয় অ্যাশট্রেতে সিগারেট চেপে নেভান। বলেন—'এই কথাগুলো এত বছব ধবে এত অসংখ্যবাব হযে গেছে যে এব পব কোথায় গিবে শেষ হবে সব আমার মুখস্থ। বলে যাব পব পব ?'

অনুনযের বলাব ভঙ্গিতে হেসে ফেলেন সুভদ্রা—'তবে আব রোজ বোজ বল কেন ? জানই তো যতদিন বাঁচব জ্বালাব।'

অনুনয হাসেন—'হ্যাঁ, জ্বালাও তো। সকালে বাজাব থেকে ইলিশ কিনে বেখেছি। বানু এসে কেটে ধুয়ে ফ্রিজে ঢুকিযে রেখেছে। এখন গোটাকতক ইলিশ ভাজা আব চা এই দিযে জ্বালাও।'

পবিবেশটা হালকা হযে আসে। জানলাব বাইবে অন্ধকাব নামছে। সুভদ্রা জানলা বন্ধ করে দিতে দিতে বলেন—'বেড কভাব গাযে জড়িয়ে মযলা কবছ। বানুটার কাচতে কষ্ট হয়। আলমাবি থেকে গাযেব চাদর বাব কবে দিই।'

অনুনয় খাট থেকে নেমে সুভদ্রাব পেছনে গিযে দাঁড়ান। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন—'পৃথিবী সুদ্দু মানুষেব দুঃখ-কষ্টেব ইজারা নিয়েছ নাকি ?'

সুভদ্রা ঘুবে মুখোমুখি দাঁড়ান। ভিতরটা আজ বড চঞ্চল হযে রয়েছে। কাছেব মানুষদেব কাছ থেকে আঘাত পেলে কেন যে এত বেশি কবে বাজে। ঠাট্টার উত্তবে ঠাট্টা করতে পাবেন না। বিরস মুখেই বলেন—'হ্যাঁ, তাই না তাই। সবো সরো বান্না ঘরে যাই। এ বেলা বোধ হয় রানু আব এল না। আজ তাড়াতাড়ি ফিবব।'

অনুনয়কে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর খোলা হাতে হাত লাগে সুভদ্রার। চমকে ওঠেন—'কী গো, তোমার গা এত গরম ?' অনুনয় সরে যান, 'হল তো ?'

—এতক্ষণ বলনি কেন ? এই জন্য বেরওনি ?

—বলার মতো কী এমন ! ফ্লু-র মতো হয়েছে।

—ওষুধ খেয়েছ ?

—খাইনি এখনও।

—কোল্ডারিন বা মেটাসিন ঘরে আছে ? আগের বারের ক-খানা ছিল যে

—আছে বোধহয়। কিছু খেয়ে খাব।

সুভদ্রা রান্নাঘরে চলে যান। চাল-ডাল এক সঙ্গে সাঁতলে তার ভেতর আলু বেগুন-টেগুন দিয়ে কুকারে বসিয়ে দিলেন সুভদ্রা। মাছগুলো বের করে নুন-হলুদ মাখিয়ে রেখেছেন। খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। সর্দি জ্বরের শরীর, টানবে। সন্ধের পর থেকে বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। তার সঙ্গে হাওয়া। হাওয়ার ঠেলায় রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। গ্যাস নিভে যাচ্ছে বারবার। বারান্দায় গিয়ে বারবার উঁকি দিচ্ছেন সুভদ্রা. সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরবেন ঠিক করেছেন। অনুনয় মাছ ভাজা আর গরম গরম আদা-চা খেয়ে বিছানায় গুড়ি-শুড়ি শুয়েছেন। একটা মেটাসিন খাইয়ে দিয়েছেন সুভদ্রা। এমনিতে ছুটির দিন ছাড়া দিনের বেলায় বাড়িতে খান না অনুনয়। যখন সায়েন্স কলেজে ছিলেন তখন তবু কখনও কখনও দুপুর বেলার দিকে ফড়িয়াপুকুরে সুভদ্রার বাড়িতে চলে যেতেন। ওখানেই খেয়ে নিতেন। কলেজ থেকে রিটায়ার করার পর এখন অন্য ইনসটিটিউটে অ্যাডভাইসার হিসেবে রয়েছেন। এদের ভাল ল্যাবরেটারি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজের সুযোগ রয়েছে। বেশ ক' বছর নতুন কী একটা কাজ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীরা, জুনিয়র অধ্যাপকরা আসে। আলোচনা হয়, শুনতে পান। সুভদ্রাকে গল্প করে বলেনও কখনও সখনও। টেমপারেচার লো করে মানুষকে যদি প্রিসার্ভ করা হয় এবং পরে প্রয়োজন মতো তাকে বাইরে বার করে আনা হয়, তবে যে বয়সে তাকে ভেতরে ঢোকানো হয়েছিল সে সেই বয়সেই ফিক্সড হয়ে থাকবে। বলতে বলতে এমন সব টার্ম ব্যবহার করেন এবং এত গভীরে চলে যান ভুলেই যান যে তিনি সুভদ্রাকে বলছেন। সুভদ্রা অত শত বোঝেন না। তিনি দেখতে পান উৎসাহে চকচকে হয়ে-ওঠা মানুষটার চোখ দুটো। আর তাতেই তিনি ভেতরে ভেতরে এক দারুণ সুখে আর গর্বে ভরে ওঠেন।

খিচুড়ি নামিয়ে গ্যাস নিভিযে সুভদ্রা ঘবে এলেন। অনুনযের কপালে হাত বাখলেন। কপালটা ঘামছে। অনুনয সুভদ্রাব হাত নিজেব হাতে নিলেন। তাকালেন–'বোসো ?'

সুভদ্রা মাথাব কাছে বসলেন। অনুনয় সুভদ্রাব শিরা-ওঠা রোগাটে হাত খানায আঙুল বুলিযে দিলেন। বললেন, 'বড্ড বোগা হচ্ছ দিন-দিন।'

সুভদ্রা হাত টেনে নিলেন–'তোমাব ওই এক কথা। কবে আমি মোটা ?' সুভদ্রা ববাববই ছিপছিপে, হাল্কা চেহারাব। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাঁকে পেছন থেকে কলেজে-পড়া তরুণী মনে কবা চলত। ইদানীং সেই কাঠামোটা ভেঙে যাচ্ছে। শবীবটা নড়বড়ে হয়ে আসছে। বিশেষ করে কোমবেব ব্যাথাটা কাবু কবে দিচ্ছে দিন-দিন। অনুনয বললেন—'ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করছ না।' সুভদ্রা অনুনযের দিকে তাকালেন, চোখে রাগ রাগ ভাব 'তুমি আবাব খামখা আমাকে নিযে পড়লে কেন ?' দেওয়াল ঘড়িতে সময় দেখলেন। সাতটাব কাছাকাছি। বললেন, 'খেয়ে নাও গবম গরম। সাড়ে সাতটায বেবব।' অনুনয কেমন একরকম করে হাসলেন–'এই দুর্যোগে তোমাকে একা ছেড়ে দেব ? খাবাব-দাবার নিয়ে বোসো। খাওয়া-দাওয়া সেবে পৌঁছে দিয়ে আসি।' খরখরিযে ওঠেন সুভদ্রা—'হ্যাঁ, তা নইলে তো আমার ষোল-কলা পূর্ণ হচ্ছে না! গাযে জ্বর, বাইরে এমন ঝড়-বৃষ্টিব বাত। এই সময উনি পৌঁছে দিতে যাবেন।'

অনুনয হাসলেন না। তাঁব গলায আদেশেব সুব–'তা হলে টেলিফোন কবে জানিয়ে দাও, আজ বাত্রে এখানে থেকে যাবে।' এইরকম আদেশের সুব তাঁব গলায কদাচিৎ শোনা যায। সুভদ্রা জানেন, এই সুব পৃথিবীব কোনও শক্তিই পাল্টাতে পারবে না। তবু তা বুঝতে দিলেন না। একই ভাবে বললেন,– 'কী বলো তাব ঠিক নেই। আমি বলেছি আজ তাড়াতাড়ি ফিবব। থেকে গেলে কেমন হবে ?'

অনুনয উঠে বসলেন। সুভদ্রার চোখে তাঁর চোখ। বললেন, 'তোমাব তেষট্টি, আমাব ঊনসত্তব। এখনও থেকে গেলে কেমন হওয়াব প্রশ্ন আছে ?' সুভদ্রা কথা ঘোরান–'না, তা নয়। আগেও তো কবেকবাব থেকে গেছি।' সুভদ্রাব ভেতবে কেমন হতে থাকে। সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে সংহত কবে শক্তি সঞ্চয করেন। তাব ছেলে-মেযে পবিবাবেব লোকজনেব ইঙ্গিত, স্বার্থপবতা এই মানুষটার কাছে মুখ ফুটে বলতে পাববেন না। এ তাঁরই পবাজয়। অনুনয

বললেন—'তখন এখানে অনিন্দ্য থাকত। আব তারও আগে তুমি মুন্নিকে নিযে আসতে।, অনিন্দ্য অনুনযেব ছাত্র। তার কাছে থেকে পড়াশুনো করেছে। ডক্টবেটও তাঁর কাছেই করেছে। বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। এই অনিন্দ্যকেই মুন্নি বিয়ে করেছে।

সুভদ্রা বললেন—'মোড়ের মাথা থেকে বাসে উঠলেই তো এক বাসে পেঁাছে যাব।'

—এক বাসে পেঁাছে যাওযা যায় আমিও জানি। কিন্তু আজ তুমি যাবে না। লোকলজ্জাব থেকে তোমাব জীবনের দাম অনেক বেশি।

—কিসের লোকলজ্জা ?

—সে তুমি জান। তোমার ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি, আত্মীয-স্বজন কে কী ভাববে!

—কে কী ভাববে বলে আমি কোনটা বাদ দিচ্ছি ?

—এসব তো ধবো, একজন অনাথ বৃদ্ধকে সেবা কবার মধ্যে পড়ছে। এব মধ্যে তোমাব নিজেবও ইগো স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে বা বলতে পার গোপন অপবাধবোবেব স্খালন।

সুভদ্রা চোখ-নামিযে ফেলেন। তাঁব গলা ভার হযে আসছে। মুন্নি যখন তিন বছবের তখন ওদেব বাবা মারা যান। একদিন অফিস গিযে আব ফিরলেন না। স্ট্রিট অ্যাকসিডেণ্ট। অনুনয সুবঞ্জনেব মামাত ভাই। তখন বিদেশে পড়াত। ছুটিতে দেশে এসেছে। সুভদ্রাব সঙ্গে প্রথম থেকেই একরকমের সখ্য ছিল। সুভদ্রার শাশুড়ি তখন বেঁচে। পিঠোপিঠি তিন ছেলেমেযে আর বৃদ্ধা শাশুড়িকে নিযে অকুল পাথাবে পড়েছিলেন সেদিন। সেদি অনুনয় না থাকলে। অনুনযেব আর ফিবে যাওযা হযনি। সবাইকে বলেছেন, 'দেশ ছেড়ে থাকতে ভাল লাগে না। সুভদ্রা বুঝতে পেরেছিলেন থেকে যাওযাব আসল কাবণ। সেদিন এই নিঃসহায অল্পবযসী মেয়েটিব মাথায় যে গুবুভার ছিল তা ভাগ করে নিয়েছিলেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত পাশাপাশি বযেছেন একই ভাবে।

শেষ পর্যন্ত ফোন কবলেন অনুনয। তাঁকে সুভদ্রার ছেলেমেযেবা বন্ধু বলে ডাকে। কবে কখন কীভাবে এই ডাক শুবু হয়েছিল আজ আর মনে পড়ে না হয়ত অনুনযই শিখিযেছিলেন। ফোন ধবল বুম্বা-'হ্যালো।'

—তোদের বন্ধু বলছি। তোদের মা-কে আজ আর পাঠালাম না। এদিকের রাস্তাঘাটে জল জমে রয়েছে। বৃষ্টিও কমেনি।

—আমি গাড়ি নিয়ে যেতে পারি।

—ড্রাইভার নেই। তুই এই রাত্তিরে আবার বেরুবি কেন? একটা রাত্তির তোদের মা-র অযত্ন হবে না।

বুম্বা একটু জেদি গলায় বলল—মা কী বলছে?

সুভদ্রা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। অনুনয়ের কথা শুনে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন ওদিকের কথা। এবার রিসিভার হাতে নিলেন,-'হ্যালো, বুম্বা?'

—বলছি।

—বলছিলাম আজ তোদের বন্ধুর শরীরটা ভাল নেই। বর্ষাও থামেনি। আমি কাল সককালবেলাই চলে যাব।

বুম্বা খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকে। এবং তারপর একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে বলে,—'এটা কোনও সলিউশন নয়। দিনের পর দিন এভাবে চলতে পারে না। দাদা-বৌদি এমন কী মুন্নিও ব্যাপারটা লাইক করছে না। তোমাকে এবার একটা ডিসিশনে আসতে হবে।'

সুভদ্রার শরীরে দুপুরবেলাকার মতো আবার রক্তকণা লাফালাফি করতে থাকে। একসঙ্গে অনেক কথা ঠেলাঠেলি করে। স্খলিত গলায় বলেন—'আমি কাল গিয়ে কথা বলব।' বুম্বা লাইন কেটে দেয়। সুভদ্রা অনুনয়ের দিকে তাকান। অনুনয়ের দু-চোখ হাসছে। সে হাসিতে আশ্বাস এবং ভরসা। বললেন,—'পারমিশন পাওয়া গেল?' সুভদ্রা অপ্রস্তুত হাসেন। শোওয়ার ঘরে যান। বিছানার চাদর পাল্টে মশারি টানান। নিপাট বিছানার মাঝখানে একটা সাদা বালিশ। অনুনয় পায়চারি করছেন। সুভদ্রা বসার ঘরে যান। অনুনয় জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি?'

—আমি এ ঘরে সোফায় শুয়ে পড়ব।

—আমার বিছানায় শুলে এ বয়সে জাত জাত যাবে না, কী বল? সুভদ্রা কিরকম এলোমেলো গলায় বলেন,—'কী যে ঠাট্টা করে সবসময়। ভাল লাগে না।' তাঁর গলায় স্বতঃস্ফূর্ত জোরটা নেই। সুভদ্রা সোফার ওপর একটা চাদর পাতলেন। একটা বালিশ। গুড নাইট জ্বালালেন। মশারিতে শুতে পারেন না। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বললেন 'রাত কোরো না। গা-হাত-পা ব্যাথা কমল?' অনুনয় আজ খুব হাল্কা মেজাজে রয়েছেন। হেসে বললেন—'না

কমলে? টিপে দিলে তো আবার তোমার জাত যাবে? সাঁইত্রিশ বছরেও আমার অস্পৃশ্যতা কাটল না।' সুভদ্রা সোফায় বসে চোখ থেকে চশমা খুললেন। চশমার কাচ কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছলেন। ভিতরে পিন ফোটার মতো সূক্ষ্ম যন্ত্রণা। কেন বুঝতে পারছেন না। আজ অনুনয়ের হাল্কা কথা তাঁর ভাল লাগছে না। অসহায় চোখে তাকালেন। অনুনয় তাঁর ঘরের ভেতর দিয়ে এ ঘরেই তাকিয়ে রয়েছেন। সুভদ্রার দিকে। বললেন, 'মাঝের দরজাটা কী হবে?'

—কী হবে?

—খোলা থাকবে না···?

সুভদ্রা এ কথার উত্তর দেন না। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেন—'আমাদের পরিচয় সাঁইত্রিশ বছর ছাড়িয়ে গেল তাই না ছোটবাবু?' অনুনয় অবাক হলেন। এই ডাকটুকু বড় নিভৃত। সুভদ্রা একে বড় কৃপণভাবে খরচ করেন। বহুদিন পর আবার উচ্চারণ করলেন সুভদ্রা। অনুনয়ের বুকে ছোট্ট একটুখানি ঢেউ খেলে গেল। সুখের এবং বিষাদেরও। সাঁইত্রিশ বছর ধরে এক অদ্ভুত সম্পর্ক লালন করে আসছেন তাঁরা। অনুনয় নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে বিছানায় গেলেন। সুভদ্রার ঘরে গুড-নাইটের মৃদু আলো। শোওয়ার সময় একটু গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজা অনেকদিনের অভ্যেস সুভদ্রার। বেশির ভাগই ঠাকুরের গান। সারাদিন সংসারের নানা পাকে জড়িয়ে থাকেন। শোওয়ার সময় মনটাকে একটু হাল্কা আর নির্লিপ্ত রাখতে চেষ্টা করেন। কাছের যারা দূরের যারা সেইসব প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা থেকেই বোধহয় এই নাম-গান। তিনি গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন। অনুনয় সুরটা ধরতে পারছেন কিন্তু ওই সুরের অবয়ব থেকে কথাগুলো আলাদা করতে পারছেন না। কিছুক্ষণ শোনার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'অতুলপ্রসাদী, না?' সুভদ্রা সুর থামালেন। আজ তাঁর ভেতর থেকে বার বার কান্না ঠেলে আসছে। তার সুরেও বোধহয় ভেতরের কান্নার আর্তি মিশেছিল, তাই গুনগুনানি সুরটুকু কেবল করুণ থেকে করুণতর হয়ে বন্ধ ঘরের বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। বললেন, 'রজনীকান্ত। তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।' অনুনয় সোজা হয়ে শুয়েছেন। তার বুকের ওপর দু-হাত আড়াআড়ি। বললেন :

—ছোটবেলায় মুনিটা কেমন দুলে দুলে এই গান গাইত তোমার মনে আছে?

—হুঁ। কেউ শুনতে চাইলে এক সেকেন্ড দেরি করত না।

—মুন্নিটাকে কতদিন দেখি না। কলকাতাটাই চার্মলেশ হয়ে উঠছে। দুটোতে দূর বিদেশে একা একা ··

—আসতে লিখলাম এত করে। কিছুতেই রাজি হল না।

—ও-তো তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তুমিও গেলে না। ছেলেমানুষী এই সময় তোমার পাশে থাকা দরকার ছিল।

—আমি গেলে এদিকে?

—এ তো তোমার স্বার্থপরতা। সত্তর হয়ে এল। আর কদিন এভাবে আগলাবে?

—ওই জন্যই তো ভয়। বয়স হচ্ছে তা তো মনে রাখ না?

—তুমি রাখ? প্রত্যেকদিন এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত ··ছেলে-বউরা রাগারাগি করবে না কেন?

অনুনয় হাসলেন। সে হাসিও কেমন বিষাদগ্রস্ত। বললেন—'আমি সবই বুঝি বউঠান। সেদিন ইনস্টিটিউটে বুম্বা এসেছিল। বলল, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই।' তারপর তো একথা-সেকথার পর খুব বিনীতভাবে প্রস্তাব করল, আমাদের নিচের এতগুলো ঘর খালি পড়ে থাকে। তুমি ওখানে গিয়ে থাকবে. চলো।'

—বলনি তো? তুমি কী বললে?

—বললাম, পৈতৃক বাড়ি। মায়া পড়ে গেছে। আসলে বুম্বা বলতে এসেছিল আমি যেন ওদের মাকে এবার ছুটি দিই। অনেকদিন তো হল।

—আ-হা কী কথা। মা-কে আবার ছুটি দেবে কে? মা-র তো স্বেচ্ছা-চাকরি। তা বাপু, তোমার তো জেদও কম না। এই ভূতের বাড়িতে একা পড়ে থাকবে তবু এই বাড়ি ভাড়া দিয়ে আমাদের ওখানে যাবে না।

—এ কথা তো অনেকবার হয়ে গেছে আমাদের। স্পর্শকাতর প্রিয় সম্পর্কগুলো থেকে দূরে থাকাই ভাল। আর তো কোথাও শিকড় নেই। এটুকুও হারিয়ে গেলে···।

টুকটাক কথায় রাত বাড়ে। সুভদ্রা হাই তোলেন। বুম্বা বড় বউমার কথাগুলো মনে পড়ে। কাল বাড়ি গিয়ে হয়ত অস্বস্তিকর পরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে। অনুনয় কিছুক্ষণ পর বললেন—'ঘুমোলে?'

—না।

—পুজোর আগে আমেরিকাতে একটা সেমিনার হওয়ার কথা আছে। ইনভাইট করেছে। ভাবছি যাব।

—যাও না। মুন্নিটার সঙ্গে দেখা হবে।

—মুন্নির কথা ভেবেই ···। তুমি যাবে? দুজনকে একসঙ্গে দেখলে একেবারে আনন্দে পাগল হয়ে যাবে।

সুভদ্রা মনে মনে ভাবছেন হয়ত এর উল্টোটাই হবে। মুন্নি যদি চিঠিতে ওরকম লিখতে পারে ···। মুখে সে কথা বলতে পারলেন না। বললেন, 'আবার একগাদা টাকা খরচ। তুমিই যাও।'

বাইরে গাছের পাতায় টুপটাপ বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে। একঘেয়ে করুণ গানের মতো। পাশ ফিরলেন সুভদ্রা। কোমরের ব্যথাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে। ডাক্তার বলেছে, বাতের ব্যথা। রাতের দিকে ব্যথাটা বাড়ে। অসাবধানে হয়ত একটু কাতরানির আওয়াজ হয়ে থাকবে। অনুনয় উঠে বসলেন—'কী হল?'

—নাঃ, ওই কোমরের ব্যথাটা। টানটান হলে লাগে।

—ব্যথার শরীরে খালি সোফার ওপর শোবে? এ ঘরে এলেই পারতে। আমি নয় সোফায় শুই।

সুভদ্রা শাসনের সুরে বললেন—'আমি যা ভাল বুঝেছি সেরকম ব্যবস্থা করেছি!' অনুনয় হাসলেন—'চিরটাকাল তোমার ব্যবস্থাই তো বহাল রইল।'

বিছানা থেকে উঠলেন। তাঁর ঘরের সামনের দরজা দিয়ে ডাইনিং স্পেসে এলেন। আলো জ্বালালেন। সুভদ্রা বিছানায় শুয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'বাথরুম যাবে নাকি?'

—না।

—তবে?

—আসছি।

সুভদ্রার চোখেও আজ ঘুম আসছে না। অনেকটা বয়স, জীবনের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে এলেও এই মানুষটির একক সান্নিধ্যে থাকলে আজও তার বুকের ভেতরটা অস্থির অস্থির লাগে। তাই, আরও কঠিন হয়ে বাঁধতে চান নিজেকেই। কোন যে এই বাঁধন, জানেন না। আজ এই বাঁধন আর বাঁধনহীনতার মূল্যই বা কী! তবু পারেন না। হয়ত একরকমের সংস্কার। পূর্ণ পাত্র আর শূন্য পাত্রের নিয়মে দুজনেই ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব আর পূর্ণ হয়ে উঠছেন একই প্রক্রিয়ায়। তবু। হয়ত অনুনয় জোর করলে দুজনে আরও একটু

কাছাকাছি হতে পারতেন। করেননি। আজ কেন, যৌবনের সেই মুখর দিনগুলোতেই অনুনয় জোর করেননি। নিজের থেকে আলাদা হয়ে দর্শকের আসনে বসে থাকা নির্লিপ্ত মানুষের মতো দুজনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-প্রেম প্রীতি-মাধুর্য-দূরত্ব সবটুকু দেখে গেছেন। অনুনয় সুভদ্রার ঘরে এলেন। আলো জ্বাললেন। সুভদ্রা চোখে হাত রেখে আড়াল করলেন। অবাক হয়ে বললেন,—'কি হল?' অনুনয় হাতে হট-ওয়াটার ব্যাগ। সুভদ্রার সোফার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন,—'এটা দাও। আরাম পাবে।' সুভদ্রা আধশোয়া হলেন—'তুমি এই রাত্তিরে উঠে গ্যাস জ্বালালে? জল গরম করলে? গ্যাসের সুইচ ঠিকমতো অফ করেছ?' অনুনয় সুভদ্রার কোলের ওপর ব্যাগটা নামালেন। সুভদ্রার দিকে তাকালেন। বললেন—'তোমার ব্যবস্থায় আমাকে বাত কাজ শিখতে হল। আর এত সামান্য গ্যাসের সুইচ নেভানো।' সুভদ্রা একথার উত্তর দিলেন না। পাশ ফিরে শুলেন। ব্যাগটা কোমরের চারপাশে দিলেন। বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। অনুনয় আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে গেলেন।

পরের দিন বাড়ি পৌঁছতে সাড়ে নটা বেজে গেল। বড় ছেলে বাবুয়া নাতি টিকলুকে নিয়ে সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে যায়। অফিসের গাড়িতে ছেলেকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে অফিস চলে যায়। বুম্বা বের হয় সাড়ে আটটায়, বড়বৌমার মরনিং স্কুল। সে সাড়ে ছটাতেই বেরিয়ে পড়ে। কাজরী সকালে রেওয়াজে বসে। সুভদ্রা খুব অপরাধবোধে ভুগছিলেন। সকালবেলা এত তাড়াহুড়ো থাকে। দশ হাতেও সামাল দেওয়া যায় না। এর টিফিন, ওর অফিসের ভাত, তার ওপর কাজরীর ছোট বাচ্চাটা। সবিতার পক্ষে একা সামাল দেওয়া অসম্ভব। বাড়িতে ঢুকতেই দেখলেন গ্যারাজে বুম্বার গাড়ি রয়েছে। দ্রুত সিঁড়ি ভাঙলেন সুভদ্রা। দোতলায় উঠেই ডাইনিং স্পেস। দেখলেন ছেলে-বউরা সকলেই সেখানে বসে রয়েছে। সবিতা পায়ের আওয়াজ পেয়ে রান্নাঘর থেকে উঁকি দিল। সুভদ্রাকে দেখে কাজরী ঘরে চলে গেল। সুভদ্রা এক পলক দেখলেনও সবগুলো মুখই ভার ভার, থমথমে। জিজ্ঞেস করলেন—'বাবুয়া বুম্বা তোরা অফিস যাসনি? বউমা তোমার স্কুল? সবাই ভাল আছে তো?' শ্রেয়া মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ভাল আছে। বাবুয়া বরাবরই চাপা স্বভাবের ছেলে। কম কথা বলে। বুম্বা

ছটফটে রাগী যুবক। একটু গোঁয়ার ধরনের। সেই কথা বলল। গলায় ঝাঁজ–'তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।'

—সেইজন্য অফিস-ইস্কুল কামাই করে সব বসে রয়েছিস ?

সুভদ্রা একটা চেয়ার টেনে বসলেন। সবিতাকে বললেন–'একটু চা দিস আমায়।' বাবুয়া বলল–'তুমি হেড অব দ্য ফ্যামিলি। তুমিই যদি এত ইনার্ডিসিপ্লিনড লাইফ লিড করো, আমরা ছেলেমেয়েদের কী শিক্ষা দেব ?'

—ইনর্ডিসিপ্লিনড। তোদের মা একরাত বাইরে থেকেছে তাই !' সুভদ্রার গলায় শ্লেষ।

বুম্বার গলা চড়ে যায়–'তুমি কি বাঁধুনি ? প্রতিদিন এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে রান্না করে দিয়ে আসতে যাবে ? তোমার সেন্স অব ডিগনিটি না-থাকতে পারে, আমাদের আছে। এবার আমাদের দিকটাও ভাবো।'

—তোদের দিকটা ?

সুর ধরে বাবুয়া–'হ্যাঁ, আমাদের দিকটা। সাত বছর বয়সে বাবা মারা যান। বুম্বা পাঁচ, মুন্নি তিন। সেদিন থেকেই দেখছি আমাদের সংসারের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একজন নন-এনটিটি, থার্ড পার্সন।'

সরাসরি এই ধরনের আক্রমণে থতমত খেয়ে যান সুভদ্রা। অনুনয়ের প্রতি তার ছেলেদের ভালবাসা না-থাক, এক ধরনের দূরত্ব মাখা শ্রদ্ধা আছে, এটুকু জানতেন ! শ্রেয়ার সামনে এই ধরনের আলোচনায় তিনি লজ্জা পেলেন। তার দিকে তাকালেন। সে-ও সুভদ্রার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে বলল–'আগে যা হয়েছে। আমি বিয়ের পর বারো বছর ধরে দেখছি রোদ-জল-ঝড়-বর্ষা-শীত প্রত্যেক দিন আপনি দুপুরবেলা বেরিয়ে যান। রাতে ফেরেন। আগে মুন্নি যেত। মুন্নির বিয়ের পর থেকে একা যান। কেন মা কী এত দায়বদ্ধতা ?'

—মনুষ্যত্বের দায়বদ্ধতা বউমা। শিক্ষিত বুদ্ধিমতী মেয়ে এটুকু বুঝতে পারবে ভেবেছিলাম। একটা মানুষের সারাজীবনের ত্যাগ '

কথা শেষ করতে দেয় না বাবুয়া। ফুঁসে ওঠে–'কীসের ত্যাগ ? উনি আমাদের একসময় দেখাশোনা করেছেন ? জয়েন্ট ফ্যামিলিতে অনেক কাকা-মামা এরকম করে থাকেন। তাছাড়া আমাদের বাবারও টাকা পয়সা ছিল। আর এ সংসার থেকে উনিও কিছু কম পাননি। ছোটবেলা থেকে ঘরে বাইরে সব জায়গায় এক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে,–'উনি কে, উনি কেন ?'

সবিতা চা নিযে এসেছে। সুভদ্রা চাযেব কাপ এক পাশে সবিযে বাখলেন। তাঁর মাথা নুয়ে পড়ল লজ্জায। এ লজ্জা তাঁর গর্ভধাবণের লজ্জা। নিজেব আত্মজদেব চিনতে না-পাবাব লজ্জা। বললেন,—'একত্রিশ থেকে আজ উনসত্তব। এতদিনেও যদি উনি কে, উনি কেন এই প্রশ্নেব উত্তব না-জেনে থাকো, সে লজ্জা তোমাদেব, আমার নয। কত অর্থ ছিল তোমাদেব বাবাব? যা ছিল তা দিযে তোমাদেব ভবণপোষণ শিক্ষাদীক্ষা সবটাই হযে যেত? আব অর্থ থাকলেই সব হয? সঠিক অভিভাবকত্বেব দবকাব হয না?'

বুম্বা একইভাবে বলে—'ধরে নিলাম আমবা নানাভাবে উপকৃত। কিন্তু তাব বিনিময়ে এই স্বেচ্ছাচাবও তো দিনেব পব দিন মেনে নেওয়া যায না। তোমাব কোনও অ্যাকসিডেন্ট হলে লোকজন বলবে, ছেলেবা কেযাবিং ছিল না। দবকাব হলে উনি এখানে এসে থাকুন। ওঁব দেখাশোনার জন্য লোকের ব্যবস্থা কবে দেওয়া যাবে।'

—দবকাব তো ওঁব নেই বুম্বা। হিমালয কে জয় কবল, না-করল তাতে হিমালযেব কিছুই এসে যায না। যে জয় কবে দায তাব।

শ্রেয়া বলল—'কিন্তু আমাদেবও তো লোকসমাজে বেবতে হয় মা! আশে-পাশেব বাড়িব লোকজন মুখ টিপে হাসে আব জিজ্ঞেস কবে, 'তোমাব শাশুড়িব খবর কী? এখনও সেই তোমাদেব মামা না কাকা কে হন তাঁব কাছে রোজ যান? ভালই আছেন!'

সুভদ্রা অনেক কষ্টে গলা পবিষ্কাব কবেন—'তোমবা কী কবতে বলছ?'

বুম্বা বলে—'শেষজীবনটা আনন্দে কাটাও। সারাভারত ঘুবে বেড়াও। আমি তোমাব খবচ বেযার করব।'

শ্রেয়া বলল—'আমাব মা-তো তিনতলায ঠাকুবঘব ছেড়ে বেবতেই চান না।'

বাবুযা বলল—'মুন্নি তোমাকে নিয়ে বাখতে চাইছে। ওব-ও সুবিধে হবে। তোমাবও নতুন দেশ দেখা হবে। যেতে চাও তো ব্যবস্থা কবি।'

শ্রেয়া বলল—'আপনাব চা-টা জল হযে গেল! আব-এক কাপ করে দেবে?'

সুভদ্রা হাসলেন। তাঁব হাসিটা তাঁব ছেলেদের কাছেও হাসিব মতো শোনাল না। বাবুযা বলল—'কাল রাত্রে অযথা থেকে গেলে। বুম্বা গাড়ি নিয়ে যেতে চেযেছিল।'

সুভদ্রা আবাবও একইভাবে হাসলেন—'তেষট্টি বছবে আব পাহাবা দেওয়াব মতো কিছু থাকে না বে, তবে মেযেমানুষ এই যা।'

অপ্রস্তুত হল সকলেই। সুভদ্রার মুখ থেকে এত সরাসরি উত্তর আশা করেনি কেউই। সুভদ্রা এরপর খুব স্বাভাবিক ভাবে উঠে পড়লেন। নিজের ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়লেন। কাজরীর ঘরে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিলেন। কাজরী সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরল। তার দু-চোখে জল। ফোঁপাচ্ছে। ওর পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন। সুভদ্রা বললেন—'বোকার মতো কাঁদছিস কেন?' কাজরী কান্না-মাখা গলায় বলল-'তোমার জন্য কাঁদছি না। বন্ধুর জন্যও কাঁদছি না। কাঁদছি বুম্বার জন্য। ভাবছি তোমার ছেলে ও! আর ওর সঙ্গেই বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।'

আজও তিনটে নাগাদ সুভদ্রা বেরলেন। তাঁর ছেলে, ছেলের বউদের চোখের সামনে দিয়েই। তারা দেখল। প্রশ্ন করল না। বেরবার সময় বললেন—'আসছি।' কেউ কোনও উত্তর দিল না।

পৌঁছে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন সুভদ্রা। অনুনয় আজ ইনস্টিটিউটে গিয়েছেন। ফিরতে সাড়ে পাঁচ-ছয় হয়ে যায়। ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলালেন। হাত-পা ধুলেন। বসবার ঘরে সোফায় বসলেন। সেণ্টার টেবিলের ওপর রাখা খবরের কাগজে চোখ বোলালেন। একটু পরে রানু এল। সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে থামল। সুভদ্রা বললেন—'কী-রে কাল এলি না যে বিকেলে?' রানু হাত থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ নামাল। অনুনয় সকালে সবজিবাজার করতে দিয়েছিলেন। বলল—'বাপরে! কাল যা বিষ্টি। আমাদের গলিতে এক হাঁটু জল।' হাত-পা ধুয়ে রান্নঘরে গিয়ে তরকারি কাটতে বসল। সুভদ্রা বললেন—'আলুর দম রাঁধব। সেই বুঝে আলু কাট।' রাণু আনন্দে লাফিয়ে উঠল—'লুচি করবে?' সুভদ্রা মৃদু ধমক দিলেন-'ইস, ফিসটি নাকি?' তারপর হেসেও ফেললেন—'বেশ ময়দাই মাখ। তোর দাদুর কাল একটু সর্দি-জ্বর মতো দেখে গেলাম।' সুভদ্রা অনুনয়ের খাটের চাদরটা পাল্টে অন্য চাদর পেতে দিলেন। ঘরের চারপাশ দিয়ে বইয়ের আলমারি। কাচের ওপর ধুলো জমেছে। ক-দিন ঝাড়ামোছা করতে পারেননি। আজ হাত লাগালেন। পড়ার ঘরে কমপিউটার, টাইপরাইটার, বইয়ের আলমারি আর পড়ার চেয়ার-টেবিল। সবই অনুনয়ের কাজের জিনিস। এ ঘরের জিনিসে পারতপক্ষে হাত দিতে চান না সুভদ্রা। মানুষটা খুঁতখুঁতে। কাজের জিনিস এদিক-ওদিক হলে রাগারাগি করেন। ঢোকার সময়ে লেটার বক্সে কয়েকটা চিঠি পেয়েছেন। সেগুলো টেবিলের ওপর রাখলেন। বসার ঘরের জন্য সুভদ্রা অনেক বছর ধরে একটু একটু করে একটা

কার্পেট বুনেছেন। কখনো-সখনো পাতেন। আজ সেখানা নামালেন। মেঝেতে কার্পেটটা পাততেই ঘরের চেহারাটাই বদলে গেল। কার্পেটের রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তুলে-রাখা আর-এক সেট টিভির ঢাকা পরালেন। সোফাসেটের কাভারগুলোও বদলালেন। আজ আকাশে বেশ কদিন পর রোদ উঠেছে। একটু হাত লাগাতেই ঘরটাও যেন হেসে উঠল। ঘুরে-ফিরে দেখে নিজেই তারিফ করলেন সুভদ্রা। রান্নাঘর থেকে রাণু ডাক দিল—'দিদিমা তরকারি কাটা হয়ে গেছে।' সুভদ্রা রান্নাঘরে গেলেন। রান্না করতে করতে রানুর সঙ্গে টুকটাক কথা বলছেন। বেল বাজল। রানু ছুটে গেল-'দাদু এসেছে।' দরজা খুলতে অনুনয় জিজ্ঞেস করলেন,—'তোর দিদা এসেছে?' সুভদ্রা অনুনয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে বেরলেন—'তোমার শরীর কেমন আছে? জ্বর নেই তো?' অনুনয় জুতো খুলে স্টাডি রুমে যেতে যেতে বললেন-'একেবারে ফিট। তোমার খিচুড়ি দারুণ কাজ দিয়েছে।' সুভদ্রা বললেন—'তোমার তিনখানা চিঠি টেবিলে রেখেছি।' অনুনয় টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা চিঠিগুলোতে হাত বোলালেন। সুভদ্রা ঘরে এলেন 'চায়ে আদার রস দেব?' অনুনয় তাকালেন—'দিতে পার।' একটু থেমে বললেন—'তারপর বাড়িতে রিসেপশন কেমন হল?'

—কীসের রিসেপশন?

—বাঃ, কাল রাতে বাড়ি ফিরলে না! হই হই হল না?

হেসে ফেললেন-'পারও বটে!'

চা আর চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে বসার ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছিলেন অনুনয়। টিভিতে একটা কার্টুন ফিলম চলছে। মুখোমুখি চেয়ারে সুভদ্রা। জিজ্ঞেস করলেন—'কি করেছ বল তো? ঘরটা নতুন নতুন লাগছে?' সুভদ্রা অনুনয়ের চোখে চোখ রাখলেন—'তোমার বিজ্ঞানীর চোখ। তুমিই বল।' অনুনয়ের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা—'তোমার ব্যবস্থায় আর তোমার সংসারে আমার তো কোনও বিজ্ঞানই এ পর্যন্ত কাজে লাগল না।' সুভদ্রা কমবয়সী মেয়ের মতো উচ্ছল হয়ে ওঠেন—'কার্পেট পেতেছি। আর ঢাকা-টাকা গুলো বদলেছি।' অনুনয় বললেন—'হঠাৎ?'

—এমনিই। বর্ষায় সবকিছু ভ্যাপসা লাগছিল।

অনুনয় আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরলেন—'বল, বল বুম্বা-বাবুয়া-বউমা রাগারাগি করল?'

সুভদ্রা গম্ভীর হলেন। সকাল থেকে এ পর্যন্ত ভেতরের ক্ষতস্থান থেকে

চুইয়ে পড়া রক্তস্রোতকে উপেক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন এটা-সেটা দিয়ে। এখন ভেঙে পড়লেন। তাঁর চোখে জল এল। কথা বলতে বলতে গলার স্বর ভার হয়ে এল। বললেন—'নিজেদের সব সাধ আহ্লাদ গলা টিপে মেরে ফেলে এদের কথা ভেবেছি। এদের বড় করা, লেখাপড়া, চাকরি, উন্নতি। এরা সুখে শান্তিতে আছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমরা আনন্দ পেয়েছি। তবে এরা এত অকৃতজ্ঞ হল কেন বলবে?' আমাদের তো কোনও ঘাটতি ছিল না।' অনুনয় মিটিমিটি হাসছেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে সুভদ্রার পাশে দাঁড়ালেন। সুভদ্রার মাথায় তার ডান হাতটা রাখলেন। ঠাট্টা করলেন—'মাথাটা বড্ড গরম হয়ে গেছে।' আজ অন্যদিনের মতো সুভদ্রা ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন না। বরং ওই হাতখানা ধরেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। অনুনয় অপ্রস্তুত হলেন। খুব আস্তে বলতে থাকলেন—'সম্পর্ক, আত্মীয়তা, রক্তের টান এরকম কতগুলো সংস্কার আর তৈরি-করা ধারণার মধ্য দিয়ে আমরা আজন্ম লালিত হই। এগুলো অক্টোপাসের মতো আমাদের ওপর চেপে বসে। তাই, সমাজের এই তৈরি-করা নিয়মের বাইরে যে কোনও সম্পর্কই অসামাজিক। সমাজে বাস করে অসামাজিক হওয়ার দায় এড়াবে কি করে? ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন কেউ তোমাকে স্পেয়ার করবে না।' সুভদ্রা অনুনয়ের দিকে তাকান—'তাহলে—'তাহলে আমার পরিশ্রম, তোমার সারাটা জীবনের এত বড় ত্যাগ এগুলোর কোনই দাম নেই? ওদের শিক্ষাদীক্ষা, বিচার বুদ্ধি ···।' অনুনয় চেয়ারে এসে বসেন—'ও সব ত্যাগ-ট্যাগ কিছু না। ওরা ওদের মতো করে নিয়েছে। আমরা আমাদের মতো করে পেয়েছি। এসব নিয়ে মন খারাপ কোরো না।' সুভদ্রা স্বগতোক্তি করেন—'সারাটা জীবন ফাঁকির ওপর কেটে গেল।' তারপর আচমকাই নিজেকে গুছিয়ে ওঠেন—'যাই রান্নাটুকু সেরে ফেলি।'

রান্না শেষ করে রানুকে গরম গরম লুচি আলুর দম খেতে দেন। রানু খেতে খেতে সুভদ্রার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। অনুনয় ডাইনিং স্পেসে আসেন। বলেন—'তোমার হল?' সুভদ্রা মাথা নাড়েন।

—তাহলে খাবার ঢাকা দিয়ে রেডি হয়ে নাও। আমি আজ পরে খাব। চলো বাসে তুলে দিয়ে আসি।

সুভদ্রা এক মনে টেবিল পরিষ্কার করছিলেন। অনুনয়ের কথার উত্তর দিলেন না। যাওয়ার জন্য ব্যস্ততাও দেখালেন না। অনুনয় স্টাডিরুমে গেলেন। বলতে বলতে গেলেন—'হলে বোলো।' মেশিনে পেপার ঢোকালেন, কিছু কাজ বাকি আছে। রানু খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ি গেল। সুভদ্রা ধীরে-সুস্থে দরজা বন্ধ করলেন। অনুনয়ের টেবিলের পেছনে দাঁড়ালেন। পায়ের শব্দে অনুনয় ফিরলেন—'তৈরি?' সুভদ্রা খুব নিবিড়ভাবে দেখলেন অনুনয়কে। তাঁর পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। অনুনয়ের হাতের ওপর তার হাতটা রাখলেন। তারপর খুব ধীরে সুস্থে বললেন—'তৈরি।'

হাওয়া-বাতাস

কাজল মিত্র

সরকারি হাইওয়ে। লোকেরা বলে পাকা রাস্তা। পাক্কীও বলে কেউ কেউ। কুচকুচে রাস্তাটা মাইলের পর মাইল ধূ ধূ করছে। মাঝে মাঝে টেলিগ্রাফ আর ইলেকট্রিক লাইনের খুঁটি। মোটর মেরামতির গ্যারেজ আর পাঞ্জাবি-ধাবাও আছে খানিক খানিক দূরে দূরে। বাঙালিরাও ধাবা করেছে। লোকে বলে বাঙালিদের পাঞ্জাবী ধাবা। পাকা রাস্তার দুধারের জমি ঢাল খেয়ে নেমে গেছে। একদিকে ভাদ্রের ভরা ক্ষেত। সবুজ আর সবুজ। কুমারী গাছগুলো ফলবতী হবার আনন্দে তিরতির করছে। কাঁচ ধানের শিসে দুধ এল বলে, দূরে আকাশ-রেখায় গ্রামের আভাস।

অন্যদিকে মাইল ভর গেলে পড়বে দামোদর। পাকা রাস্তা নদীর সঙ্গে যেন সমান্তরাল ভাবে এগিয়েছে। নদী আর রাস্তার মাঝের জমিতে ইটভাঁটা আর বালি-খাদানের বেপরোয়া রাজত্ব। মৌরসীপাট্টা গেড়েছে সব। মাঝে মাঝে বালিময় জমিতে ফুটি, তরমুজ আর কুমড়োর লতারা খাপছাড়াভাবে লতায়।

ভরা দামোদর। ভুটভুটির শব্দে নদীর ঘাট দিনভর সরগরম থাকে। ঘাটলায় নদী তোলপাড় করে বালি তোলে মজুররা। লরী বোঝাই হয়ে শহরে যায়। বাঁধের ওপর সার বেঁধে দাঁড়ায়। এদিকে ইলেকট্রিক নেই। দিনমানে কাজ সারে সবাই। আকাশে চাঁদ না থাকলে অন্ধকার যেন বসে বসে ঝিমোয় নদীর ঘাটে। নদী পেরিয়ে গাঁখানা। একটু ভেতর দিকে। উঁচু পাড়ে বাঁশবন। নারকেল, বট, জাম, জারুলও আছে। তেঁতুল পুকুরের মাঠ। ভূতের মত দাঁড়িয়ে ছাড়া ছাড়া তালগাছ। কোন্ মান্ধাতার আমলে পোড়ান একটা ইঁটের পাঁজা আজও রয়ে গেছে। সারা অঙ্গ গাছগাছালিতে জমজমাট সবুজ। এরই পাশে অবনীর ঘর। খোড়ো চালের মেটে ঘর। উঁচু দাওয়া। উঠোনের একপাশে ছোট রান্নাশাল। কাঠের জ্বালের পাতা উনুন। একটা নিমগাছ। আর আছে ভালু কুকুর। কেউ কেউ বলে ভূলো, ভুলু, ভেলো। অবনীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত চলে। ভিটেটা ঘিরে কাদার গাঁথনির ছোট পাঁচিল।

নদীর কাছাকাছি উঁচু পাড়ের ওপর একটা সরকারি অফিস। জমিদারি

আমলে ছিল কাছারি বাড়ি। ইংরেজ আমলে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। এখন ওটা গ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটা আঞ্চলিক দপ্তর। একজন বেয়ারা, দুজন কেরানী আর তাদের মাথার ওপর এক বাবু। আর আছে অবনী। জমিদারি সেরেস্তা থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস, তারপর গ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অফিস। অনেক পাল্টাপাল্টি হয়েছে। কিন্তু অবনীরা একই রকম আছে। পাংখাপুলার। বিদ্যুৎবিহীন এই মুলুকে অবনী অফিসের পাখা টানে। মাইনে পত্তরের দিক দিয়ে এখনও সেই রাজার প্রজা।

ভাদ্রের দিনটা গনগনে ভ্যাপ্সা, চারদিক কেমন থম্ মেরে আছে। শনিবার। দুপুরের পর অফিস খালি হয়েও হয় না। অবনীরও তাই ছুটি নেই। মোটা রশিটা ছেড়ে দিয়ে কড়াপড়া হাতের চেটো দুটোর দিকে তাকিয়ে দম নেয়। কালচে নীল শক্ত শক্ত দানা। ছেলেবেলায় অবনী তার বুড়ো ঠাকুরদার হাতে এই দাগ দেখেছে। বাবার হাতেও। পেশার সঙ্গে সঙ্গে দাগগুলোও বংশ ধরে আসে। সে দাগমারা হয়ে গেছে। চৈত্র থেকে আশ্বিন। বাকি মাস গুলোয় অন্য ধান্দায় ঘোরে।

—ঘুমুচ্ছিস নাকি রে? ঘরের ভেতর থেকে বড়বাবু হাঁক দেয়। ছোট অফিসের বড়বাবু। ঝাঁজ বেশি।—শালা বড্ড গরম হয়েছে। বিড়বিড় করে অবনী মোটা রসিটা টানে। রঙিন ঝালর লাগান টানাপাখা। অবনীর মেয়ে মানুষ মুক্তো সোহাগ করে লাগিয়ে দিয়েছিল। আহা বড়বাবু হাওয়া খাবে। অবনী অন্ধকারে চোখবুজে দেখতে পায় তার হাতের টানে রঙিন ঝালর হেসে লুটোপুটি খেয়ে বড়বাবুকে হাওয়া খাওয়াচ্ছে। অবনীর বদলি হিসেবে মাঝে মাঝে পাখা টানতে এসে এক সন্ধেয় বাবুর সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল। তারপর বাবুর বাঁধা। হাওয়া আর মেয়েমানুষে এখন বিশ্বাস নেই অবনীর। কলজে ঠাণ্ডা করতে যতক্ষণ ঘর ডাঙতেও ততক্ষণ। অবনীর হাতের চেটো দুটো নিসপিস করে। ইচ্ছে হয় গোটা পৃথিবীকে দুহাতের চেটোয় টিপে ধরতে।

ফি শনিবার যেন কাজের ঝোঁক ওঠে বাবুর, সন্ধে গড়িয়ে যায়। অফিস না বাবুর কাছারি। নদীর ওপাড়েই তো জমিদারি। একেবারে চোখের ওপর। নামে বেনামে তিনটে ইঁটভাটা, দুটো বালি খাদান। বসুমাতার বুকের দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে। ধু ধু জমিতে নদীর হাওয়া হা হা করে। অবনী বলে— পিথিমি নিশ্বেস ফেলছে গো, জেবন সব শুকিয়ে যাবে। তা কার জীবন কে

শুকোয়। মাটির বুকের দুধ বাবুর সিন্দুকে ক্ষীব হয়ে তোলা থাকে। বাবুর বাড়ি এ তল্লাটে নয়। বাসে চেপে যেতে হয় শহবেব কাছাকাছি। তো আপিসেব কাজে এসে বাবু নদীব বালি ছেঁকে সোনা বাব করতে শিখে গেল। ইঁটভাটা আব বালি খাদানেব পাইকেবি বাজাব যেন এ তল্লাট। অল্পে সুখ নেই। অনেক অনেক আবো অনেক। অফিসে বসে নিজেব কাছারি সামলেও মাস গেলে মোটা মাইনে অফিস থেকে।—বাহারে! বাহাবে! কড়া পড়া হাতে তালি বাজিয়ে অবনী গান ধবত।

তো সাঁজের বেলা বাবুব পিত্তি পড়ে যেত। ছোট একটা ডিঙি নৌকো বেয়ে অবনী নিয়ে যেত ওপাড়ে। পিচ বাস্তাব ওধাবে গুবুনাম সিংএব ধাবা। আসতে যেতে পায়ে পায়ে জড়ায় এক আধটা ফুটি বা কুমড়োব লতা। 'ধুত্তোবি' পায়ে ঝাঁকুনি ওঠে। তব সয় না। ধায় টলটল ঢলঢল কবছে কাচকুমারী, রঙিন বোতল সুন্দবীবা। অন্ধকাব বাত রঙিন হয়ে যাবে। গুবনাম সিং এগিয়ে আসত—সত্শ্রী আকাল। এখানেও কিছু ব্যবসা কর্ম, বিষয় কর্ম সারা হত। শনিবার আব ববিবাব। ঘোব রাতে ট্রাক আসে। আব ভোর রাতে ট্রাক ছাড়বার আগে উধমলাল চোখ মটকে কপালে হাত ছোঁযায—রাম বাম বাবুজী রাম রাম। সেই সব বাতে ধাবায ঘুরে যেত পদ্মমণি, মুক্তো আর ধুনী বাঈ। এমনই এক বাতে মুক্তো হাওয়া হয়ে গিয়েছিল বাবুব কলজে ঠান্ডা করতে। পাথাব বশি টানতে টানতে অবনীব বুকেব খাঁচা হাপরেব মত ওঠানামা কবে। হাপবেব হাওয়া পেয়ে কলজেব আগুন গনগনিয়ে ওঠে।

সন্ধে অনেকক্ষণ উতবে গেছে। ঢাকা দালানে বসে অবনীর কালো দেহ দবদবিযে ঘামে। যেন গর্জন তেল মাখা অসুব। ঘুলঘুলিব ভেতব থেকে নেমে আসা বশিটাকে মনে হচ্ছে কালনাগিনী। অবনীব হাতেব টানে তিরতিব করে কাঁপছে। কাকে ছোবল বসাবে কে জানে! দবজা জানালা ভেতর থেকে সাঁটা।—বুড়ো ভাম্ ঘবে সেঁধিযে বসে হাওয়া খাবে। অবনী বিজবিজ কবতে কবতে দবজাব ফাটলে চোখ রাখল। টেবিলে মোম জ্বলছে। গোছা গোছা নোট নড়াচড়া কবছে বাবুব হাতে। জীয়ন্ত নাকি? আঙটিব পাথর থেকে বংবেবং ঝিলিক দিচ্ছে। ফিনফিনে আদ্দিব পাঞ্জাবি গাযেব সঙ্গে লেপ্টে। গলায় সোনাব চেন।

—হাত চালা হাত চালাবে হাবামজাদা। বদ্ধঘবেব ভেতবের গর্জন দবজা জানলার ফাটল ফোঁকব দিয়ে গুম্ গুম্ করে বার হয়। অবনীর পাশে বসে

ভালু জিভ বার করে হাঁসফাঁস করে। অন্ধকারে জ্বলজ্বলে চোখ। তিন পুরুষ ধরে হাত চালিয়ে অবনীর হাত আর চলে না। ফাটলে চোখ রেখে টাকাগুলো গিলতে থাকে।

এক দম চাপা গরমের রাতে অবনীর বৌটা মরে কাঠ হয়ে পড়েছিল। মুখটা হা করা, বুকের অসুখ ছিল। রাতদিন হাঁপের টান। কুঁড়ে ঘরে এতটুকু বাতাসের জন্যে শেষপর্যন্ত হাঁকুপাঁকু করেছিল। মেয়ে দুটো মাটির দাওয়ায় ঘুমিয়ে। জানতেও পারেনি। যেদিন বিস্তর গরম পড়ে সেদিন রাস্তার ধারে বটগাছের তলায় খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকে রাতে। রশি দড়ি কিছুই লাগে না। বটগাছ ঝিরঝিরে পাতা নাড়িয়ে পাংখাপুলারকে হাওয়া খাওয়ায়। অবনী গলা ছেড়ে গান ধরে—শোনো হে পিথিমিবাসী ভালবাস পোকিতেরে। পাইবে শীতল হাওয়া কলিজা জুড়াইবে। খাটিয়ার তলায় পুটুলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে ভালু। আবেশে চোখ বোজে। নারী ও প্রকৃতি দুইয়েরই প্রয়োজন জীবনে। তাই মুক্তো এসেছিল। মুক্তো যে রাতে বাবুর সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল, অবনী ঘেন্নায় নিজের কড়াপড়া হাতের তালুতে থুতু ছিটিয়ে ছিল।

মা মরা দু মেয়ে। ধার করে, অর্ধেক ভিটে বেচে বিয়ে দিয়েছে। বড় মেয়ে এসে কপাল চাপড়িয়ে বাবাকে দোষী করে—মুক্তো পিসিকে ঘরে তুলবে, তো দিলে একটা বাউণ্ডুলের গলায় ঝুলিয়ে সাত তাড়াতাড়ি। সে মানুষটার আছে কেবল আগাপাশতলা খিদে। একঘর ছেলেপিলে। সব খরচ অবনীই টানে। অবিকল মায়ের মুখ পেয়েছিল ছোটটা। এত তাড়াতাড়ি মেয়েদের কাছ ছাড়া করতে চায় নি। তো কি হবে, ভাদুরে খেয়োবা আছে না। ছোট জামাইএর কারখানা মালিক বন্ধ করে দিয়েছে। এখনও কুড়ি পার হয়নি ছোট মেয়ে দুছেলের মা। দেখে মনে হয় খরাপীড়িত কি বানভাসি। এসে কেঁদে পড়ে—শহরের খাতায় নাম লেখালে তুমি শান্তি পাবে বাবা! ছেলেপিলে নিয়ে গোটা গোটা দিন উপোস দি।

বৌ মারা যাবার পরে অবনী মেয়ে দুটোর হাতে পাখার রশি ধরিয়ে দিয়ে আটকে রাখত। নিজে যেত অন্য ফিকিরে। তারপর ঘর গেরস্থালী সেরে অফিসে এসে কোনদিন দেখত মেয়ে দুটো বাবুর কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে কোনদিন বা কপাল টিপছে। বাবু সিকিটা আধুলিটা গুঁজে দিত।—আহা! মা মরা মেয়ে কোথায় মাঠে ঘাটে ঘুরবে, এই ভাল আমার কাছে চোখে চোখে

থাকবে। বশি টানাব আগে অবনী মটমট করে হাতের আঙুল মটকে নিত। কোনদিন বা বাবু কাতুকুতু দিযে মেযে দুটোব সঙ্গে খেলাধুলো কবত।—কেমন বেনাবনেব মত ফনফনিযে বেড়ে উঠছে দেখেছিস। চোখ সরু কবে সামনের অনেকটা পর্যন্ত দেখতে চাইত যেন। অবনী হাঁই হাঁই রশি টানত—শালা ভাদুবে ঘেযো।

কতদিন পাতেব ভাত ভালুব মুখে ধবে দেয় অবনী। ঠাকুবকে নিবেদন কবাব মত মেযেদেব, নাতিনাতনীদেব মুখ মনে কবে ভালুব খাওয়া দেখে।

এমনটি কোনদিন দেখেনি অবনী। আজ শনিবাবেব অফিস ছুটিব পব দিনদুপুবে এক বোতল মদ গিলিয়ে গেছে উধমলাল বাবুকে। হঠাৎ এত পীবিত কিসেব বুঝল না অবনী। এদিকে চাপা খটাখটি ঝটাপটি চলছে একটা কদিন ধবেই। ধাবাওযালা গুবনাম সিং, ট্রাক মালিক উধমলাল, আর বাবু।

রশি ছেড়ে দিয়ে আবাব জানলাব ফাটলে চোখ রাখে অবনী। ছোট বাক্সটাকে পাখাটানাব এক টুকবে বশি দিযে বাবু আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে। সেটাকে কাপড়েব থলিতে ঝুলিয়ে নিল। ঢুলুঢুলু চোখে ছোট খোকাব মত টলটল করতে কবতে শেষ পর্যন্ত বাব হল।

—ওরা এখনও খবব দিল না কেন বলত ?

—হরদম ঢুকুঢুকু তুমি আজ।

—কি বলছিস।

—খপব দিযেছে।

উল্টোদিকেব দেওযালে বাবুব মাথাব মস্ত ছায়া পড়েছে। যেন কালো হেঁড়ে তাল একটা। অফিস ঘবে, দালানে চাবি দিতে দিতে অবনী গুনগুন কবে—তালেব বড়া খেয়ে যাদু নাচিতে লাগিল।

—বড্ড গরমি আজ। বাবু পকেটে চাবি ঢোকায।

—টাকাব গবম মদের গবম তোমার।

—কি বলছিস বলত ?

—বলছি সকালে ধাবায পুলিস এযেছিল। গোপন থানে যেতে বলেছে। বেতে আমি খপব দেব।

—পুলিশ। জোব করে চোখ খুলে অবনীকে দেখতে চাইল ঘুমে ঢুলে পরা ছোট খোকাব মত।

—জলসত্রেব ঘবে চল। সিংজীব বাবণ আছে। বেতে ওবা আসবেখন।

ভালুটা খানিক এগোয় আর ছুটে ছুটে আসে। ঘন ঘন লেজ নাডে। বাবু মনে মনে চিন্তা কবে পুলিশেব কথা তো উধমলাল কিছু বলল না। তবে কি··? কুলকুলে একটা ঠাণ্ডা ছোঁওয়া শিবদাঁডা বেযে বাবুর মাথায় ওঠে।

—অবনে তোর এই ধর্মবাজ কোনদিন বিপদে ফেলবে। বেটাবা নাক দিযে দেখে। পুলিসের কথায মৌতাত ফুটে যাবার দাখিল।

দামোদবেব জল কাচকাচ। চক্‌চকে। তো জল কি হবে! নুন গোলা। তাঁতকালের জন্য বাবু এক জলসত্র কবে দিযেছে। খোডো চালেব মেটে ঘব। বলতে গেলে অফিস আব অবনীব বাডির মাঝামাঝি। সবই নদীর ধাবে, বড বড মেটে জালা, একঘটি জল দুটো বাতাসা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে জল দান করলে মাতৃহত্যাব পাপ দূর হয। তা পেটের জন্য ইদিক সিদিক একটু ব্যবসা কর্ম। পাল্লায চাপালে মাতৃহত্যাব চেযে অনেক হালকা। তবুও জল দান! বড পুণ্য!

নদীব ধাব ববাবর আধ মাইলটাক ঘুটুর ঘুটুব কবতে করতে আসা। অবনী তালা খোলে। মাটিব জালাগুলো উপুড করা। পাল্লা ছাডা কাঠের গারদ দেওযা একটা জানালা। সস্তাব ছোট তক্তা, অবনী হাত দিযে সাফসুফ কবে দিল। —তুমি ভেতব থেকে খিল মেবে থাক। বাবু তক্তায় গা এলিয়ে দেয়। চোখ জডিযে আসে। —আঃ মাইবী বলছি তোব হাতে এমন মিঠে হাওযা খেলে না। নোনা নদীব মিঠে হাওযা' —তুমি জিবোও আমি মাঠ ফিবে আসি।

নদীব ধাব ববাবব অবনী হাঁটে। জলসত্রেব্‌ ঘাট। খেযা অনেকক্ষণ বন্ধ হযে গেছে। সব সুনসান, নদীব হাওযা বাঁশ বাগানেব ভেতব দিবে সোঁ সোঁ কবছে। জমাট অন্ধকাবে থোকা থোকা জোনাকি। ভালুকেও জলে নামিয়ে ছিল অবনী। হাত দিযে ঘসে ঘসে চান কবায—চান কব বেটা ঠাণ্ডা হ। ঝাডা দিয়ে লোমেব জল ঝেডে নেয ভালু। অবনী হাঁ কবে বাবকতক শ্বাস নেয, বুকেব মধ্যে তালবাদ্য।

চাপ বাঁধা অন্ধকাবে কালো-কেঁদো শবীবেব ধুতি পাঞ্জাবিটাই কেবল ফুটে উঠেছে। গরাদের ভেতব হাত দুটো গলিযে দেয; তেল তেলে এক গাদা মাংস। ঘামে পিছলে হযে আছে। সোনাব চেন! ছিটকে হাত দুটো সবিয়ে নেয় অবনী। গা ঘিনঘিন করে! হাতডে থলিটা টেনে নিল। টিনের ছোট

বাক্সটার গায়ে জড়ান বশিটা খুলে নেয়। মাত্র দুটো হাত। দুটোই মুঠি। ভাবতে কতক্ষণ! নদীব বালি-কাদায পাযেব ফাটাগুলো কুটকুট কবছে। দু মুঠো—মাত্রা দু মুঠো টাকা তুলে নিল অবনী। ভিজে গামছা থেকে, গা মাথা থেকে সমানে জল ঝরছে। কাদা কাদা চটচটে পা। ডান হাতেব টাকাব বাণ্ডিলটা দাঁতে কামড়ে ধবে। কোমবেব গামছা খুলে উঠোনে ন্যাতা দিয়ে নিকিযে দেবার মত কবে জাযগাটা মুছতে মুছতে পিছতে লাগল। বালি কাদায জ্যাব জেবে গামছাখানা। কি ভেবে ছুড়ে দিল বাঁশ বনে। খস্ করে একটা শব্দ।

নদীব হাওযা অবনীকে ঠাণ্ডা কবতে পাবছে না। শরীব দিযে আগুন ছুটছে। সম্পূর্ণ উদোম। —হে মা বসুমাতা অপবাধ নিও না। সোনা নয় দানা নয়, প্রাণ তো নয়ই। মাত্র দু মুঠো টাকা। দু মুঠো অন্ন তুলে দেবে উপোসী পেটে। নেমকহারাম নই মা আমি বসুমাতা গো। অজস্র ছোট ছোট কীট যেন অবনীর গা বেয়ে উঠতে লাগল। ঝেড়ে ফেলতে পাবছে না। বাণ্ডিল দুটো দাঁতে চেপে নদীর ঘাটে ঝুঁকে বসে হাতেব কাদা ধোয। নতুন নোটেব সোঁদা গন্ধ! আঃ প্রাণ ভবে শ্বাস নিল। অল্প অল্প জিভে ঠেকে। আঃ কি সুন্দব সোয়াদ! তবুও অবনী শিউরে শিউরে ওঠে। পিঠের কাছে নবম কি যে ঠেকে। চমকে অবনী উঠে দাঁড়ায়। ভালু। অন্ধকারে দাঁত বাব কবে হাসছে যেন। অবনীর উদোম শবীবে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ নিচ্ছে। বেটা ধর্মবাজ নাক দিয়ে দেখে। —নেমকহাবাম! শালা কুত্তা। অবনী সপাটে এক লাথি বসিযে দিল। বিকট চিৎকাব কবে ভালু নদীর জলে ছিটকে পড়ল। একটা জান্তব আর্তনাদ নদীব ধাব ববাবব গড়িযে গড়িযে গিয়ে ওপাড়ে মিশে গেল। বাঁশবনেব আনাচে কানাচে দাপাদাপি কবে ঝোড়ো হাওয়া। কটব কটব কবে রাত চরা পাখি মিশে গেল অন্ধকাবে। কাঁপুনি ধবে গেল অবনীব শবীবে। মাত্র দু মুঠো টাকা অবনী হজম কবতে পারছে না কেন। মনে মনে বাবুব হজম শক্তিব তারিফ করে অবনী। বাণ্ডিল দুটো দাঁতে চেপে নদীতে ঝাঁপ দিল। জল দাগ বাখে না। সাঁতবে নিজের বাড়ির কাছেব ঘাটে উঠবে।

উঠোনে একটা তালগাছ। গোড়ায় জড়ান বেশ খানিকটা রশি। মাটির বড় দুটো মালসা। খানিকটা জল ও ভাত তখনো আছে। ডালাভাঙা কাঠের বড় বাক্সে চট পাতা। তালপাতায খরর মরর শব্দ হয়। অন্যমনস্ক অবনী চমকে ওঠে। চোখ দুটো মরুভূমির মত।

ছোট বান্নাশালে পাতা উননে পাতা পুতি দিযে আগুন জ্বালে। সেঁকে নেবে।

ভিজে একেবাবে ন্যাতা চুবড়ি হয়ে গেছে নোটগুলো। —অবনে এযেছিস? অবনে? খপ্ করে ভিজে বাণ্ডিল দুটো কোমরে শুকনো লুঙ্গিব কাসিতে গুঁজে নিল। —এগুলো রইল। বেশ করে গরম মশলা আব প্যাঁজ রসুন দিয়ে রাঁধবি। ধাবায যেতে বারণ কবেছে সিংজী। অবনী চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে রান্নাশালে। —ধাবায় ধবল নাকি বে? উনুনশালে আগুন পোহাচ্ছিস! অবনী কেবোসিনের ঢিব্‌বিটা নিয়ে দাওয়ায় রাখে। থলি ভর্তি বাজাব। দুটো গলা কাটা মুরগি। বুকেব ধুকপুকি তিরতির করছে তখনও। টসটসে কাঁচা রক্তে মাটি ভিজে। শিবে আব মলিন্দ।

—আমি পারব না। অবনী ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

—দিক কবিস না। রাত বাড়লে সিংজীকে আনতে হবে। উল্টোপানে ডিঙি বেয়ে হাতে খাল ধবে গেল মাইবী।

—তোর বাবু কোথায়? ওরা মুরগি ছুলতে বসে গেল।

—জানি না। রান্নাঘরেব দোর গোড়ায় অবনী দাঁড়িয়ে।

—অবনে তোর বাহন কোথা রে? এখনি সব পেসাদ করে দেবে আবার। জবাব না পেয়ে শিবে আব মলিন্দ নিজেরা কথা বলে—উধমলালের সঙ্গে আমাদেব বাবুর নাকি মিটমাট হয়ে গেছে? কে যেন দেখেছে অপিসে, খুব পীরিত। অবনে তুই কিছু জানিস না? সকালে পুলিস এযেছিল ধাবায।

হাঁড়িতে টগবগ করে মাংস ফুটছে। অবনী কাঠ ঠেলে ঠেলে শেষ। বাইরে ওরা গল্পে মত্ত। কোমরে লুঙ্গিব কাসিতে হাত বোলায়। লুঙ্গিটাও ভিজে উঠেছে। উনুনের গায়ে এগুলো মেলে দিলে গরম উনুন-মাটি নোটের জল শুষে নেবে। রান্নাশালেব আগড়টা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে বসল অবনী। টগবগ করে মাংস ফুটেই চলে। খুব বাস ছেড়েছে। এগুলো নিয়ে অবনী এখন কি করে! জলে ন্যাতা হয়ে জড়িয়ে গেছে। ছাড়া যাচ্ছে না। ভিজে কাদা। আগুন ছোঁবে না। অবনী দু হাতে নোটগুলো ডলতে থাকে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। তারপর টপাৎ করে মাংসের হাঁড়িতে ফেলে দিল—খাও বাবুরা টাকা খাও। অবনী হাঁফ ছাড়ে। বিষন্ন অবনী ওদের কাছে গিয়ে বসে। পাঁচিলের ফোঁকর দিয়ে কারা উঁকি মারছে। যদু বাগদী, বাটা নাপিত আব বুধো।

—বলিস কিরে!—হ্যাঁ গো জানলা দিয়ে টর্চ মেরেছিল চৌধুরী বাবু। ইদিকে কপাট ভেতর থেকে খিল মারা।

—গলায় দগদগে রশির দাগ। থলি বাঁধার রশি। থলির মুখটা খোলা। এতখানি জিভ।

—থানায় খপর গেছে। কি থেকে কি বেইরে যাবে বাবারে! লোকে বলছে নিজেরা নিজেরা।

—সিংজী জানে?—জানি না পেইলে যাও সবাই ইখান থেকে। বাবারে কি দেখলাম। পেইলে যাও সবাই। উঠোন ফাঁকা হয়ে গেলে।

সোনা নয় দানা নয় প্রাণ তো নয়ই। কিছুই নিইনি। মাত্র দু মুঠো টাকা। কটা উপোসী পেটে দুটো অন্ন পড়ত মা। মাত্র দু মুঠো। সেই পাপে ভিটে ছাড়া করলে হে মা বসুমাতা। পেইলে যাও। অবনী না পালিয়ে ফিরে এল জলসত্রের ঘাটে। অনেক খুঁজেছে। ঐতো কুণ্ডুলী মেরে পড়ে আছে। অবনীকে দেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে চাইল। চাঁদ উঠেছে এবারও। ফিকে অন্ধকারে অবনী বুঝতে পারল। ভালুর শিরদাঁড়া জখম হয়েছে। পেছনের পাও। ভালুকে বুকে নিয়ে বাড়ি এল অবনী।—খাস ভালু এক হাঁড়ি মাংস রেঁধে গেলাম। পেট পুরে খাবি।

অবনী পেরিয়ে এল নদীর ধারে ধারে সেই সব গাঁ যেখানে তার মেয়েরা বাবার ওপর অভিমান করে বাবারই মুখ চেয়ে আছে। আকাশ থেকে অন্ধকার চুঁইয়ে নেমে চরাচর কালি করে দিয়েছে। কখনো ডুব সাঁতার কখনো চিত সাঁতার, কখনো ভেসে থাকা। এই তো জীবন। যে জানে সে পারে। মাথার উপর এক আকাশ তারা প্রাণপণে জ্বলছে। প্রহর শেষের শিশির ঝরল বলে। বাবু একদিন এ ভাবে মরবে অবনী যেন মনে মনে জানত, টাকা পাপ হজম করাতে পারে না। নোনা নদীর মিঠে হাওয়া। অবনী চিৎকার করতে চাইল—শোনো হে পিথিমি-বাসী ভালবাস পোকিতিরে পাইবে শীতল হাওয়া, কলিজা জুড়াইবে।

আমার সুরঞ্জনা

শিবাশিস দত্ত

পারসোনাল কমপিউটারে প্রোগ্রাম পুরে দেবার পর অপারেটর শুধু কি-বোর্ডে আঙ্গুল চালায়। স্ক্রিনে কারসার (CURSOR) যেমন যেমন নাচে তেমন তেমন ডিজিটের কি (key) ছুঁয়ে যেতে হয় অপারেটরকে।

আমাদের স্বামী-স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যার সংসারটাতে একই ঘটনা ঘটছে। সুরঞ্জনা যেমন যেমন প্রোগ্রাম বানিয়েছে আমি তেমন তেমন ডিজিট ছুঁয়ে যাচ্ছি। সুরঞ্জনার চোখ কারসারের কাজ করে। আমি ওর চোখ দেখলেই বুঝতে পারি কখন কি করতে হবে।

সকালবেলা, ঘুম থেকে ওঠার পর চায়ে সবে মুখ দিয়েছি। সুরঞ্জনা প্রথম কাজের কথাটা শোনাল। জানো, আজ মিস্ত্রি একা এসেছে, লেবার আসেনি। আমি মুখ টিপে হাসলাম। সুরঞ্জনা সাহেবি কেতা পছন্দ করে অথচ লেবারারকে বলছে লেবার। আমার কোন রাগ হল না কারণ এরকম ইংরেজী শব্দই তো আজকাল চলে। দেখি কি করা যায় বলে আমি দুধের ডিপোয় ছুটলাম। দুধ নিয়ে বাড়ি ফেরার পর সুরঞ্জনা বলল, রনির স্কুলভ্যান আজ আসেনি। ওকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে। রনির স্কুল বেশী দূরে নয়। রিকসা চেপে রনিকে গসপেলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সুরঞ্জনা বলল, বাজার যাবে না? রান্না হবে কি? আমি সাথে সাথে বাজারের ব্যাগ নিয়ে ছুটলাম। সাত সকালে বাজার তেমন জমে না। হুড়মুড় করে বাজার সেরে বাড়ি ফিরলাম। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজছে। স্নানের মুখে মিস্ত্রির সাথে কথা বলতে বলতে শুকনো ইটে জল ঢাললাম, ছড়ানো বালি খানিকটা জড়ো করে রাখলাম। এমন সময় একজন লেবারার এল। মিস্ত্রীদের কাজগুলো চটপট বুঝিয়ে দিয়ে স্নান সারলাম। দু-চারটে ভাতের গ্রাস নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়লাম। অফিসের লেটমার্কটা বাঁচাতেই হবে। শেষ অবধি ট্রেনটা ম্যানেজ হল, রানিং ট্রেনটাতেই উঠে পড়লাম। আমার সহযাত্রী শিবুদা আমার রানিং ট্রেনে ওঠার দৃশ্যটা দেখে-ছিলেন। হাওড়ায় নেমে শিবুদার ধমক খেলাম। প্রবীর, এভাবে রানিং ট্রেনে কেউ ওঠে? শিবুদার মেজাজী স্বর কানে এল। আমি বললাম, কি করব

শিবুদা, বাড়ীতে দোতলার ঘর তুলছি, মিস্ত্রি লেগেছে। আজ সকালেই মিস্ত্রির এমন ঝামেলা যে··। তাই দেরী হয়ে গেল। যা হোক কবে কোন কথা বললেই শিবুদা মানে না। ধমক খেতেই হয়। ধমকের সুরে শিবুদা বলল, প্রবীর, কদিন ছুটি নাও। এভাবে কেউ রিস্ক নেয় ? বলতে বলতে বাসে উঠে পড়ল শিবুদা। আমিও ধরমতলার বাসে চেপে অফিস পেঁৗছে গেলাম।

অফিসটা হয়েছে ভাল। লেটমার্ক বাঁচাতে পারলেই দিনের অনেকটা কাজ ম্যানেজ হয়ে যায়। কাজ নিয়ে হাবডুবু খেতে হয় না। ইউনিয়ন আছে। এখন কটা দিন তাড়াতাড়ি অফিস-পালানোর ব্যাপারটা ম্যানেজ হয়ে গেছে। শিবুদা ছুটি নেবার কথা বলছে। ছুটি কোথায় ? দিন কুড়ি ছুটি পাওনা আছে, ভাঙা যাবে না। ওটা এল. এফ. সি ট্যুরের জন্য তোলা আছে। সারা বছরের প্রোগ্রামটা, বছরের পর বছর চলবার প্রোগ্রামটা সুরঞ্জনা যেমন যেমন বানিয়েছে আমাকে তেমন তেমন চলতে হয়। আট বছর ধরে এভাবেই চলছি। এখন এল এফ. সি ট্যুরের ছুটি বাড়ীর কাজের জন্য নেওয়া চলবে না। বেড়াবার সময় ছুটি নেই বললে সুরঞ্জনা ক্ষেপে যাবে। অতএব ম্যানেজ-ফ্যানেজ করেই দোতলার কাজটা সারতে হবে। বাড়ীতে মিস্ত্রি কাজ করছে এ খবরটা ইউনিয়নকে আগাম জানিয়েছি। এখন দোতলাটা শেষ করতে পারলে বাঁচা যায়।

আমাদের বাড়ীতে যে দুটো ঘর আছে সেটা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুরঞ্জনা একথাটাই বলছিল কিছুদিন যাবৎ। আমাদের ঘরে জিনিসপত্র অনেক। ফ্রিজ, কালার-টিভি, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, সোফা-সেট, গোদরেজ আলমারি, ওয়াশিং মেসিন, গ্রাইন্ডার সবই আমাদের কেনা হয়ে গেছে। আমি মটর সাইকেল চাপা পছন্দ করি না। সুরঞ্জনার কথায় দু-চাকা কিনেছি। আমাদের বাড়ির টেলিফোনটা কর্ডলেস। সুরঞ্জনা এখন টি. ভি'র নতুন নতুন চ্যানেল কেনায় জন্য ছটফট করছে। দোতলা বানাবার কথা শুনে সুরঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভাড়া বসাবে নাকি ? সুরঞ্জনা বিরক্তির স্বরে বলেছিল, তোমার কোন সেন্স নেই। দোতলা না হলে বাড়ীর শো আসে না এটাও বোঝ না। সুরঞ্জনা ঘ্যান ঘ্যান করছিল দোতলার জন্য। মেয়ের পড়ার ঘর, একটা আইসোলেশন রুম, একটা ভাল ড্রয়িং রুম না হলে প্রাইভেসি থাকে না। সুরঞ্জনার কথা মেনে নিয়ে আমি দোতলার কাজে হাত দিয়েছি।

গৃহসজ্জার সঙ্গে স্ট্যাটাস সিম্বল আঠার মত লেগে আছে। সুরঞ্জনা ওর স্বরটাকে এমনভাবে লালন করেছে, আমাদের সংসারে ওর সমস্ত ইগোটাকে এমন-

ভাবে খেলিযে দিয়েছে যে এখন আব সংসাবেব প্রোগ্রাম বদলে দেওয়া যাবে না।' বনির ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে পড়াটা সুরঞ্জনাব ইগো। আমি এ নিয়ে কখনও কোন অশান্তি কবিনি। আমি সুবঞ্জনাকে এমন কথা কখনও বলি না যা আমাদেব সংসাবে অশান্তি ডেকে আনতে পাবে সুরঞ্জনা একটা লোমশ কুকুব পোষে। আমি বাড়িতে কুকুব পোষার আদিখ্যেতা পছন্দ কবি না। শুধু সুবঞ্জনা কষ্ট পাবে ভেবে বাড়ীতে কুকুব ঢুকিযেছি। সুবঞ্জনা 'জননী' সিরিয়াল খুব পছন্দ কবে। আমি টি ভি কে বোকা বাক্স বলতে ভালবাসি। কিন্তু বাড়িতে অমন কথা কখনও উচ্চাবণ কবি না। ওর বূপচর্চা, কেশচর্চার বাড়াবাড়ি থেকে শুরু কবে সানন্দা, মনোবমায় ডুবে থাকাব আনন্দ কিংবা সন্তোষী মা নিযে গদগদ ভাব এসবেব কোন কিছুতেই আমি বাধা দিই না। আমাব পুবনো বটুক দু-চাব জন বন্ধু এসব নিযে হাসি ঠাট্টা কবে। আমি কেযাব কবি না। আমাব মনটাকে কব্জা কবে চূড়ান্ত ভোগবাসনায ডাইভার্ট করে দিচ্ছে সুবঞ্জনা—এমন কথাও শুনতে পাই। কিন্তু আমি তো জানি, আমি যা কিছু করছি তা সুরঞ্জনাকে ভালবেসেই। সুবঞ্জনাব কাছে আমাব এ ভালবাসাব মূল্য নেই, একথা, আমি মেনে নেব কেন? কৃষ্ণনগবেব পৈতৃক বাড়ি ছেড়েছি। ডানকুনিতে জমি কিনে বাড়ি বানিযেছি। সুবঞ্জনাকে খুশি কবব বলেই না? ও যেখানে যেমন করে সংসাবটা পাততে চায তাব সুযোগ আমি কবে দিযেছি। এতে অন্যায কোথায? আমাব দু-চার জন বন্ধু পৈতৃক বাড়ি ছাড়াব সময আপত্তি কবেছিল। ওদেব কথা—"বাড়ি ছাড়তে হয কলকাতাব ওপর কোথাও জায়গা দেখ্ প্রবীর। ডানকুনিতে তো তোব শ্বশুরবাড়ি, ওখানে জমি কিনে পাকাপাকি বাসস্থান বানানো ঠিক হবে না।" আমি ওদেব কথা শুনিনি। ওবা মনে মনে হযত ভেবেছে, সুরঞ্জনার বাপেব বাড়িব চাপে আমি ডানকুনিতে আশ্রয নিচ্ছি, যাকে বলে শ্বশুরবাড়িব কলকাঠি। আমি এসবে আমল দিই না। আমি সুবঞ্জনাকে ভালবাসি।'

সুরঞ্জনাব শখ-ইচ্ছেগুলোতে আমি আপত্তি করি না ঠিকই কিন্তু পাঁচ বছরেব মেযে বনি যদি কখনও ভুল বলে, ভুল শেখে তখন কি চুপ কবে থাকা যায়? গস্পেলে বনি তখনও ভর্তি হযনি। আমি বললাম, বনি স্টেশনেব কাছে একটা ভাল স্কুল আছে ভর্তি হবি? বনি বলল, কোন স্কুল? আমি বললাম 'বিনোদিনী'। বনি মুখ গোমড়া কবে বলল, ও স্কুলে আমি পড়ব না। ওখানে মিনু পড়ে। আমি সুবঞ্জনাকে জিজ্ঞেস কবলাম, মিনু কে? সুবঞ্জনা

তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, আমাদের বাড়ীব কাজের লোক মন্দিরাকেও চেন না? মন্দিরার মেয়ে মিনু ঐ স্কুলে পড়ে। আমার ভীষণ রাগ হল। মুখ ফসকে কটা কথা বলে ফেললাম সুরঞ্জনাকে। সুবঞ্জনা, আমবা তো বনিকে এরকম কথা শেখাই নি। তবে ও কেন এ বয়সেই মিনুকে ঘেন্না করতে শিখছে? সুবঞ্জনা আমার কথায় হাঁড়িমুখ হল। গোমড়া মুখে পাশের ঘবে চলে গেল। তারপব থেকে বনি সম্পর্কেও কোন কথা আমি সুরঞ্জনাকে বলি না।

অফিসে বসে এসব কথা ভাবছিলাম। আমার কি নিজস্ব কোন ভাবনা নেই? আমি কি সুরঞ্জনার কাছে সাবেণ্ডার কবেছি? সাত পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ শিবুদার কথা মনে হল। শিবুদার স্নেহপ্রীতি মনটাকে ভাল রাখে। শিবুদার কথা মাথায় নিয়ে অফিস থেকে বেবিয়ে পড়লাম। শরীরটাও বড্ড ক্লান্ত লাগছিল। বাড়ী ফিরে চা-জলখাবাব খেয়ে সুবঞ্জনাকে বললাম, কাঠের মিস্ত্রিব সঙ্গে কথা বলতে বেরোচ্ছি। একথা বলে সোজা শিবুদার বাড়ীতে ঢুঁ দিলাম।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। শিবুদাব বাড়িব দরজায পৌঁছে হাঁক দিলাম, শিবুদা, বাড়ী আছেন?

গম্ভীর মেজাজী গলা শোনা গেল। আরে প্রবীব, এসো, এসো।

—শিবুদা, মেজাজটা ভাল নেই, শরীরটাও ক্লান্ত। তাই আপনার বাড়ী একটু আড্ডা দিতে এলাম।

—বেশ করেছ। বাড়ীব কাজ কেমন এগোচ্ছে? ধীবে, বৎস ধীরে।

ধকল যাচ্ছে শিবুদা. খু-উ-ব। তবে হয়ে যাবে।

শিবুদা একটু থেমে অন্য কথা পাড়ল। আচ্ছা প্রবীব, তোমায় একটা কথা বলি, রাগ করো না। তোমায় ভালবাসি তাই বলছি কথাটা।

—নির্ভযে বলুন শিবুদা। আপনাব কথায রাগ কবি না।

—না, মানে, রাতদিন যেভাবে ছোটাছুটি কবছ তাতে দুশ্চিন্তা হয। বিছানায না পড়ে যাও। সবকিছু এত তাড়াহুড়ো কবে করবার প্রযোজন কি? বৌ যখন যা বলবে তাই করতে হবে নাকি?

—আমি শিবুদার কথাব ইঙ্গিতটা বুঝলাম। বললাম, না শিবুদা, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। সুরঞ্জনার সঙ্গে অভিনয করছি।

—তার মানে? স্ত্রীর সঙ্গে অভিনয?

—হ্যাঁ, সেরকমই বলতে পারেন।

—পাগলামি, প্রবীব। এ তোমার পাগলামি। কোন অর্থ হয় এবকম অভিনযের।

—অর্থ আছে শিবুদা। পবে বলব। আজ উঠি। শবীবটা দুর্বল লাগছে। চটপট শিবুদাব বাড়ী থেকে বেবিযে রিক্সা ধরলাম। বাড়ী ফিবে মনে হল আব দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। বিছানায সটান শুযে পডলাম। সুবঞ্জনাকে বললাম, শীগগিব ডাক্তার ডাকো। শবীবটা খুব খাবাপ লাগছে।

ডাক্তারবাবু এলেন। সব দেখে বললেন জন্ডিস। অবস্থাটা ভাল নয়। কমপ্লিট বেড বেস্ট। বড্ড দুর্বল হযে পড়েছেন। বিশ্রাম নিন। সুস্থ হতে সময লাগবে। ডাক্তাববাবু কথাগুলো সুরঞ্জনাকে বুঝিযে চলে গেলেন। আমি আবছা সব শুনতে পেলাম।

বিছানায শুযে শুযে দিনগুলো কাটছে, নানা কথা মনে আসছে, সুরঞ্জনার ধকল যাচ্ছে বেশ। সাবাদিন ওকে দেখছি। ও কেমন বেকায়দায পড়ে গেছে। হঠাৎ কদিন যেতে না যেতেই কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ল সুরঞ্জনা। ওর ভেতরে কিছু একটা তোলপাড় হচ্ছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, হযত আমারই অনুমানে কোথাও ভুল হচ্ছে। সুরঞ্জনা হয়তঃ মনে মনে শক্ত আছে, স্বাভাবিক আছে। আমি দুর্বল শরীরে হয়ত এলোমেলো ভাবছি।

এভাবে দু-দুটো মাস কেটে গেল। এখন খানিকটা সুস্থ বোধ কবছি। শরীবের অবস্থাটা একটু ভাল বোধ কবছি মনে হলো। সুরঞ্জনাকে গলা ছেড়ে ডাকলাম। শুনছ? আমি এখন প্রায় সুস্থ। আর ভেবো না। আবার সব কিছু স্বাভাবিক হযে যাবে। সব কাজগুলোতে আবার হাত লাগাব। সুরঞ্জনা কেমন মনমবা হযে আমার কথাগুলো শুনল। কোন উত্তর দিল না। আমার ভাল মনে হল না। জিজ্ঞেস করলাম, সুরঞ্জনা, কথা বলছ না কেন? সুরঞ্জনা দাঁতে দাঁত চেপে কাঁদছিল। কান্না জড়ানো গলায় বলল, আমি আর পারছি না। আমি এবার পাগল হয়ে যাব।

—কেন সুবঞ্জনা? ওকথা কেন বলছ? আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম বলে ভয পেয়ে গেছ? শরীরের ওপব তো কারও হাত নেই। আমি তো সুস্থ হয়ে উঠেছি। এখন আব ভাবছ কেন? এবার চটপট দোতলার ঘরগুলো হয়ে যাবে। সুবঞ্জনার মনটাকে স্বাভাবিক করবার জন্য বললাম, মনে আছে, এটা ডিসেম্বব মাস। বাইশে ডিসেম্বব আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। এবাব জমিয়ে করব অনুষ্ঠান। আমি তো এখন একেবারে সুস্থ। আর তুমি মার্চ মাসের প্রোগ্রামটা

তো ভুলেই গেছ। আমাদের এল এফ সি টু্যর এবার কন্যাকুমারী ফিক্সড হয়ে আছে ভুলে গেছ সব? আমাব এত কথার পর সুরঞ্জনা নির্বাক, নিরুত্তর থাকতে চাইছে দেখে আমাব কেমন সন্দেহ হল। ও কি তবে অন্য কথা ভাবছে? গত দু মাসের মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি তো যা সুরঞ্জনাব সব ভাবনা-গুলোকে ওলট পালট করে দিযে গেছে? আমার অসুস্থ শবীবটাকে দেখে দেখে ও কি নার্ভাস হযে গেল?

সকালের রোদের আলোয খুঁটিযে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম সুরঞ্জনাকে। সত্যিই তো কেমন মিইযে গেছে। আমি কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ বনি ছুটে এল আমাব কাছে। আমাব কানে মুখ গুঁজে বলল, জানো ড্যাডি, কদিন ধরে মাম্মি ভীষণ কাঁদছে। মাম্মি কেন কাঁদছে, বল না ড্যাডি? তোমার শবীর খারাপ তাই কাঁদছে মাম্মি?

আমি সুবঞ্জনার মনেব অবস্থাটা আঁচ কবতে চাইলাম। ওর তো এত ভেঙে পড়ার কথা নয়। শ্বশুববাড়ি কাছাকাছি, ওব বাবা-মা এ সময়টাতে বল-ভরসা যুগিয়েছে মেয়েকে। তবে ও কেন এত ভেঙে পড়ল? তবে কি ভাই কিল্টু, বিল্টুর স্ত্রী রমলাব সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাটি হল? বনি বলছিল, বেশ কিছুদিন সুরঞ্জনা ও বাড়ি যাচ্ছে না, দাদু-দিদাব কথা বললেই ধমক দেয। তবে কি বমলা এমন কিছু বলেছে যাতে সুরঞ্জনার মাথা ঘুবে গেছে?

আমি এটা-সেটা ভাবছিলাম। সুরঞ্জনা হঠাৎ আমার হাত দুটো চেপে ধরল। মিনতির স্ববে বলল, তুমি রাগ করবে না বল? আমার কথা শুনে রাগ করবে না?

আমি বললাম, কখনও বাগ করেছি তোমাব কথায? বল, সব কথা খুলে বল।

—এ বাড়িটা বিক্রি কবে দাও। এখানে আর থাকব না।

আমি যেন বাজ পড়ার শব্দ শুনলাম। বলছ কি সুবঞ্জনা? তোমাব কি মাথা খারাপ হযে গেল? বাড়ির দোতলা বানাবাব জন্য দৌড ঝাঁপ কবতে করতে জণ্ডিসে পড়ে গেলাম, এখন বাড়ি বিক্রি কবে দেব?

—হ্যাঁ বিক্রি কবে দাও। আমি এক মুহূর্ত আর এখানে থাকতে চাই না। বিল্টু, বমলাদের মুখ আমি আব দেখতে চাই না। ওরা আমায় যে অপমান করল তাতে তোমারও মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস কবলাম, বমলা কি বলেছে?

—কথায় কথায় সেদিন বিল্টু হঠাৎ কেমন ক্ষেপে গেল। বাবা-মা, রমলা সামনেই ছিল। আমায় বলল, তোর সংসারটা তুই দ্যাখ না। বাবা-মার ভালমন্দ আমরা বুঝব। তোকে নাক গলাতে হবে না। বিয়ের পর মেয়েদের নিজেব সংসারে মন দিতে হয়। রমলা এ বাড়ির বৌ। ওকে সবকিছু বুঝতে দে। তোকে মাতব্বরি করতে হবে না। শুনেছি তোর ঘরেব ভদ্রলোক জণ্ডিসে পড়ে গেছে, এখন ওদিকটা সামলা। সুরঞ্জনা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কান্নার স্বরে বলল ,তুমি তো জান আমি বিল্টুকে কতটা ভালবাসতাম। ও এখন রমলাব কথায় ওঠ বোস করছে! স্পাইনলেস!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সুরঞ্জনা রমলা কি বলেছে বললে না?

সুরঞ্জনা একটু দম নিয়ে বলল, বনি ও বাড়িতে গিয়েছিল। রমলা ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় নি। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বনিকেও সহ্য করতে পারছে না ওরা। না-না-রমলা, বিল্টু—ওদের মুখ আমি আর দেখতে চাই না। ও বাড়ীতে আমি আর যেতে চাই না। বাবা-মা কেউ প্রতিবাদ করল না? তুমি ভাবতে পার এসব? গত দু মাস তুমি বিছানায় শয্যাশায়ী, চোখের দেখা দূরে থাক, উল্টে অপমান করল আমায়। ওরা মানুষ নেই, জানো, বিল্টু রমলা সেন্স হারিয়ে ফেলেছে।

আমি সব কথা শুনে সুরঞ্জনাকে শান্ত করতে চাইলাম। বললাম, মাথা গরম করো না, ভেবে চিন্তে যা হোক্ করা যাবে।

সুরঞ্জনা বলল, আমি কোন কথাই শুনতে চাই না। বাড়ি বিক্রি করে দাও, কৃষ্ণনগরেই আবার ফিরে যাব। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

আমি চমকে গেলাম। বলছো কি সুরঞ্জনা? কৃষ্ণনগরে আবার ফিরে যাওয়া যায়? অবশ্য গেলে মন্দ হয় না। বনিটার কথা ভাবলে কান্না পায় আমার। ওর কোন সাথী নেই। বাড়ির কুকুরটাকে নিয়ে খেলতে খেলতে ও হাঁপিয়ে উঠেছে। কৃষ্ণনগরে দাদার ছেলেটার সঙ্গে হৈ-চৈ করে কাটাতে পারবে বনি।

সুরঞ্জনা আমার কথাগুলো এক মনে শুনছিল। ওর চোখ মুখে হারিয়ে যাওয়া প্রত্যয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটছে বলে মনে হলো আমার। ক্লান্তিতে, এক ঘেয়েমি আর অপমানে জ্বলছিল সুরঞ্জনা। ও এতদিনের ক্লান্তিকর, গ্লানিকর ফ্যামিলি প্রোগ্রামটা এবার যেন ভাঙতে চাইছে। পারসোনাল কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বদলে যেমন নতুন প্রোগ্রাম পুরে কাজ চলে সুরঞ্জনার বোধোদয় ঘটবার পর সেরকম নতুন ফ্যামিলি প্রোগ্রাম আবার জেগে উঠতে চাইছে। এখন এ

মুহূর্তে সুরঞ্জনার চোখ দুটোই যদি কারসারের কাজ করে ক্ষতি নেই। ওর চোখে এতকাল যে রঙীন চশমাটা ছিল সেটা এখন আর নেই। সুরঞ্জনা এখন ওর চোখ দুটোকে আমার চোখের সামনে মেলে রাখবে। তাছাড়া ওর কোন উপায় নেই।

আমি এতদিনের অভিনয়টা থামিয়ে দিলাম। শিবুদার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, একবার ছুটে যাই শিবুদার কাছে। এতদিনের অভিনয়ের পালা শেষ হবার খবরটা দিই। আবার মনে হল, না, এখন থাক। পরে দেখা করব শিবুদার সঙ্গে। এখন সুরঞ্জনাকে নিয়ে অনেক বেশী ভাবতে হবে। সুরঞ্জনা আমাকে বাঁচাল, ও নিজে বাঁচল। এখন সুরঞ্জনার জন্য আরো বেশি মন দিতে হবে। ও একা চলতে পারে না, আমার ভরসা ছাড়া সুরঞ্জনা চলতে পারে না। ও যে নিজেকে বদলাতে চাইছে তার কারণটাও ওর কাছে স্পষ্ট। আমি ছাড়া সুরঞ্জনার আশ্রয় নেই।

আমি সুরঞ্জনাকে আবো কাছে ডেকে নিলাম। আমার সব কথা শুনতে শুনতে আবেগে ও জাপটে ধরল আমায়। আমি পরম তৃপ্তিভরে চুম্বনের আবেশে ওকে জড়িয়ে নিলাম।

"পরিচয়ে" প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী

সরোজ হাজরা

চতুর্থ কিস্তি

শ্রাবণ, ১৩৬৮—আষাঢ়, ১৩৭৮

[বিষয়সূচীর প্রথম সারিতে লেখকের নাম, বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো দ্বিতীয় সারিতে বিষয় এবং তার অধীন আখ্যা-শিরোনাম এবং তৃতীয় সারিতে পরিচয়ের প্রকাশ কাল। এই ধারার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক, নাট্যকার ও জীবনীর ক্ষেত্রে। সেখানে মূল বিষয়-বিভাগের বা উপ-বিভাগের অধীন বর্ণানুক্রমিকভাবে আলোচিত ব্যক্তির নাম সাজানো হয়েছে এবং তাকেই একটি বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছে।

বিষয়সূচীতে ব্যবহৃত সংকেতচিহ্নগুলি ঃ

অনু ঃ অনুবাদক বা অনু-লেখক
পুঃ মুঃ পুনর্মুদ্রণ
আঃ পুঃ আলোচিত পুস্তক।
সং ঃ সংকলক
সঃ সম্পাদক

বিঃ দ্রঃ পরিচয়ের অনেকগুলি সংখ্যাই স্থানীয় সংগ্রহে না থাকায় এবং সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অন্যত্র সংগৃহীত সংগ্রহসূচীর প্রতিলিপি গুলির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হওয়ায় সঠিক বিষয়সূচী নির্ণয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে পাঠকবর্গের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে।]

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	সাময়িক পত্র	
পঞ্চানন সাহা	'সুলভ সমাচার প্রসঙ্গে'	আষাঢ়, ১৩৭৪
বিনয় ঘোষ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অর্থনীতিক দৃষ্টি	শ্রাবণ, ১৩৭০
ভবতোষ দত্ত	সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র	শ্রাবণ, ১৩৬৯
	পরিচয়-ইতিহাস	
অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	পরিচয় প্রসঙ্গে	কার্ত্তিক, ১৩৭০
গোপাল হালদার	বিদায় নমস্কার, বিবিধ প্রসঙ্গ	আষাঢ়, ১৩৭৪

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিবোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
ভবানী সেন	পরিচয়ের পৃষ্ঠপট	বৈশাখ, ১৩৭০
মিহিব হাজবা	পবিচয় প্রসঙ্গে : পাঠক গোষ্ঠি	কার্ত্তিক, ১৩৭০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩৭টি বর্ষা পবিচয়ে	শ্রাবণ, ১৩৭৪
	সংবাদ পত্র ও সাংবাদিকতা	
আদিত্যপ্রসাদ চৌধুরী	সংবাদ পত্র : মযনা তদন্ত	আষাঢ়, ১৩৭০
	দর্শন	
বীকোভস্কি, বি.	সাম্প্রতিককালে দর্শনেব দুই শিবিরের সংগ্রামেব কযেকটি বৈশিষ্ট্য	পৌষ, ১৩৬৯
ভবানী সেন	দর্শনে সমসামযিক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাব	শ্রাবণ, ১৩৬৯
	মনস্তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক	
	ফ্রয়েড্, সিগমণ্ড	
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ফ্রয়েড : হ্যারি ওয়েলস্ লিখিত মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড ও প্যাভলভ সম্পর্কিত গ্রন্হের উপব আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
	ভাবতীয দর্শন	
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	ভাবতীয দর্শনে ভাববাদ ও ভাববাদ খণ্ডন : প্রস্তাবনা	আশ্বিন, ১৩৬৮
ভবানী সেন	ভাবতীয দর্শন : মার্কসবাদী বিচার	শ্রাবণ, ১৩৬৮
	হিন্দু ধর্ম	
	বেদ	
শংখ ঘোষ	ভাবতচর্চা : রমেশ দত্ত অনূদিত এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘ঋগবেদ সংহিতা’ গ্রন্হেব উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	রামায়ণ	
রবীন্দ্র মজুমদার	রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি ঃ প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থের উপর আলোচনা	শ্রাবণ, ১৩৭০
	হিন্দু ধর্ম—আধুনিক যুগ	
	বিবেকানন্দ	
গোপাল হালদার	স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী	মাঘ, ১৩৬৯
নিশীথ কর	বিবেকানন্দের রাজনৈতিক চিন্তা	ঐ
	সমাজতত্ত্ব	
অসীম রায়	সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসা	চৈত্র, ১৩৭৬
	প্রজন্ম ব্যবধান	
অন্নদাশঙ্কর রায়	এক পুরুষ ফাঁক	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
	সমাজ ও সংস্কৃতি	
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	সংস্কৃতি ও সমকাল	পৌষ, ১৩৬৯
নৃপেন গোস্বামী	সংস্কৃতির সংজ্ঞা	শ্রাবণ, ১৩৬৯
	রাষ্ট্রনীতি	
	রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ	
সুকুমার মিত্র	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ সামাজিক চুক্তি জাঁ জ্যাক রুশো অনু ঃ নীলকণ্ঠ চৌধুরী	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
	মার্কসবাদ	
অরবিন্দ বসু	মার্কসবাদ ঃ বিজ্ঞান ও বিপ্লববাদের মিলন ঃ পত্রিকা প্রসঙ্গ	বৈশাখ, ১৩৭৬
অশোক রুদ্র	তরুণ মার্কস	শ্রাবণ, ১৩৭০
গোলাম কুদ্দুস	আর এক রমণী ঃ মার্কসপত্নী সম্পর্কে	পৌষ, ১৩৭০
দিলীপ বসু	বৈজ্ঞানিক এঙ্গেলস্	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	মার্কসবাদ ও নৈতিকতা	শ্রাবণ, ১৩৭৬

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
নাগরিক সভা	মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা ফ্রিডারিক এঙ্গেল্স্	কার্তিক, ১৩৭৭
নিশীথ কর	মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব ঃ মস্কোর ফরেন ল্যাঙ্গওয়েজ পাব্লিশিং হাউস প্রকাশিত ফান্ডা মেটাল অব মার্কসিজম লেনিনিজম্ গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
কমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	মার্কসবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি গোড়ার কথা	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
ভবানী সেন	কমিউনিজমবাদে মার্কসবাদ	শ্রাবণ, ১৩৭৩
ঐ	মার্কস-এর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি	শ্রাবণ, ১৩৭০
ম্যালিশ, আলেকজান্ডার	ক্যাপিটালের আর এক গ্রন্থকার	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৭
রমেন মিত্র	মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা	ভাদ্র, ১৩৭১
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	মার্কসবাদ ও যুক্তফ্রণ্টের শিক্ষা	ভাদ্র, ১৩৭৫
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	মার্কসের শিল্প-মানস ও সোভিয়েত শিল্প বিভ্রাট	আষাঢ়, ১৩৭০
সুকুমার মিত্র	লাফার্গ দম্পতি ঃ মস্কো ফরেন ল্যাঙ্গওয়েজ পাব্লিশিং হাউস প্রকাশিত করেসপণ্ডেন্স—ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পল এ্যাণ্ড ফেরা লাফার্গ গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
সুজয় মিত্র	মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা ঃ অন্যমত	আষাঢ়, ১৩৭১
সুশোভন সরকার	সংশোধন পুনরাবৃত্তি—সম্প্রসারণ	আশ্বিন, ১৩৭০
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বিপ্লব, আবেগ ও প্রজ্ঞা	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
অশোক রুদ্র	সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ প্রসঙ্গে ঃ	পৌষ, ১৩৭০

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	পুস্তক পবিচয়	
	আঃ পুঃ দ্যফিলসফি অব ম্যান-স্যাফ, এ্যডাম	
অশোক রুদ্র	মানবিকতাবাদ প্রসঙ্গে : সমালোচনাব উত্তব	কার্ত্তিক, ১৩৭১
আইনস্টাইন এ্যালবার্ট	কেন সমাজতন্ত্র	শ্রাবণ, ১৩৭৫
গৌতম সান্যাল	সমাজতন্ত্রে শিল্প আলোচনা ও চর্চা : ভিন্ন চিন্তা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০
চিন্মোহন সেহানবীশ	কমিউনিজম্‌ ও বুদ্ধিজীবী সমাজ	শ্রাবণ, ১৩৭২
সতীন্দ্র চক্রবর্তী	সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা	বৈশাখ, ১৩৭০
সিতাংশু ভট্টাচার্য	পবিচযেব পৌষ সংখ্যায প্রকাশিত অশোক মিত্রেব "হিউম্যানিজম্‌" সংক্রান্ত কিছু মন্তব্য প্রবন্ধেব উপর হীবেন্দ্র মুখোপাধ্যাযের আলোচনায় সমালোচনা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১
সুজয মিত্র	সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ : এডোযার্ড কাডেঁলিব লেখা 'সোশিযালিজম এ্যান্ড ওযাব' গ্রন্থেব উপব আলোচনা	শ্রাবণ, ১৩৭০
	আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন	
তবুণ সান্যাল	মৃত্যুহীন কমিউন	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭১
ভবানী সেন	বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনেব ভিতরকাব সমস্যা	আশ্বিন, ১৩৭৩
হেমন্ত সেন	গুরুবাদ ও যুক্তিবাদ : ক্রড কর্কবান লিখিত "ক্রসিং দি লাইন" এবং 'ভিউ ফ্রম দি ওযেস্ট' গ্রন্থেব আলোচনা	শ্রাবণ, ১৩৭০
	অর্থনীতি	
	ভাবতীয় অর্থনীতি	
অশোক রুদ্র	আমাদেব অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ	ফাল্গুন, ১৩৬৮
দীনেশ বায	ভারতেব অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ	কার্ত্তিক, ১৩৬৯

লেখক	বিষয় ও আখ্যা–শিবোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
অশোক মিত্র	জাতীয় পরিকল্পনা, পণ্ডিত নেহরু এবং আমরা	আশ্বিন, ১৩৭১
কল্যাণ দত্ত	পবিকল্পনাব সলিল সমাধি	শ্রাবণ, ১৩৭৪
তরুণ সান্যাল	ভারতেব পবিকল্পনা ঃ নতুন দৃষ্টিতে	শ্রাবণ, ১৩৭২
দামোদর ধর্মানন্দ কৌশম্বী	বিজ্ঞান ও পবিকল্পনাব সমস্যা	আশ্বিন, ১৩৭৩
প্রিয়তোষ মৈত্র	পবিকল্পনাব সংকট	চৈত্র, ১৩৬৯
রণজিৎ দাশগুপ্ত	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনার ভবিষ্যৎ	আশ্বিন, ১৩৬৮
সন্তোষকুমাব ভট্টাচার্য	সোভিয়েত পবিকল্পনা কৌশলে সাম্প্রতিক পরিবর্তনেব তাৎপর্য	আশ্বিন. ১৩৭৩
	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও শান্তি আন্দোলন	
অমল দাশগুপ্ত	আইনস্টাইন ও শান্তি ঃ অটো নাথাএ এবং হেইনজ নর্ডেন সম্পাদিত "আইনস্টাইন অন পিস" ও শৈলকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "আইনস্টাইন ঃ জীবন জিজ্ঞাসা" গ্রন্থের আলোচনা	শ্রাবণ, ১৩৭০
শঙ্কর চক্রবর্তী	হিবোশিমা ঃ একটি দিনেব স্মবণে	শ্রাবণ–ভাদ্র, ১৩৭৭
	প্রশাসক বর্গ	
বাসব সরকাব	ব্যুবোক্রাসী	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
	সামাজিক ব্যাধি তাব প্রতিকাব	
দীপা সর্বাধিকারী	কলকাতায গণিকাবৃত্তি প্রসঙ্গে	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৪
ঐ	একটি সমীক্ষা ঃ কলকাতায় গণিকালয প্রসঙ্গে	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৪
	শিক্ষা–পশ্চিমবঙ্গ	
অমূল্যচন্দ্র সেন	বাংলা দেশেব আধুনিক শিক্ষা সংকট	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
শ্যামল চক্রবর্তী	শিক্ষা ও গণতন্ত্র	মাঘ, ১৩৭০
ঐ	পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাসমস্যার	

লেখক	বিষয় ও আখ্যা–শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	কয়েকটি দিক	মাঘ, ১৩৭১
	ভাষা শিক্ষা	
অন্নদাশঙ্কর রায়	মাতৃভাষা ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা চিঠি	আশ্বিন, ১৩৭০
	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা	
কেয়া চক্রবর্তী	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ কমনওয়েলথ্ লিটাবেচাব—জন প্রেস সম্পাদিত	বৈশাখ, ১৩৭৩
	বিজ্ঞান শিক্ষা	
হলডেন, জে বি এস	বিশপ ও স্পুটনিক	অগ্রহায়ণ, ১৩৭১
	উচ্চ-শিক্ষা	
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৬৫ ও শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা	মাঘ, ১৩৭২
	বৈদেশিক বাণিজ্য	
বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়	বিনিময় হাব হ্রাস টাকার না ভাবতের	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৩
	সামাজিক বীতি নীতি—আচাব ব্যবহার	
	বিবাহ ও পবিবার	
সুগত সেন	প্রথম বিধবা বিবাহ ঃ ইয়ং বেঙ্গল, রাজা দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায় কৃত বিবাহ	কার্ত্তিক, ১৩৭১
	লোক সাহিত্য, ছড়া	
তুষার চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সংস্কৃতি ও লৌকিক জিজ্ঞাসা ম্যারিযা লীচ সম্পাদিত “স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশনাবি অব ফোকলোব, মিথলজি এ্যাণ্ড লেজেণ্ডস’ এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিত ‘বাংলাব লোক সাহিত্য’ গ্রন্থেব উপব আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
মানিক সবকার	লোককৃতি ও বাঙলাদেশ	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭১

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
স্মরজিত চক্রবর্তী	উত্তরবঙ্গের ছড়া ও ধাঁধা	আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৭৭
	নৃতত্ত্ব	
	ভারতের মুসলমান সমাজ	
	মুসলিম লেখক ও সাহিত্যিক	
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	পুস্তক পরিচয় আঃ মুঃ বিলুপ্ত হৃদয়—আজাহার উদ্দিন খান	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৩
	হিন্দু-মুসলিম সমস্যা	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভেদবুদ্ধি ঃ সর্বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সম্মিলনির প্রতি পুনমুঃ (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৮)	চৈত্র, ১৩৭০
শান্তিময় রায়	ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ	ভাদ্র, ১৩৭৫
ঐ	ঐ	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
	ভারতের উপজাতি ও আদিবাসী	
চিন্ময় ঘোষ	কলকাতায় একটি সাঁওতালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ।	চৈত্র, ১৩৭৫
ঐ	সুন্দরবনের উরাও আদিবাসী	শ্রাবণ, ১৩৭৬
সুনীল সেনগুপ্ত	ভারতের পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার বিশিষ্টতা	চৈত্র, ১৩৭৬
	ভাষাতত্ত্ব	
অসীম রায়	ভাষা ভাষা ভাষা	মাঘ, ১৩৭২
	ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা	
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	ভাষা বিভ্রাট ও আদিবাসী সমস্যা	আশ্বিন, ১৩৭০
সুশোভন সরকার	ভারতের ভাষা সংকট	শ্রাবণ, ১৩৭২
	বাংলা ভাষা ও ভাষা সমস্যা	
ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক	পশ্চিমবঙ্গের অপভাষা প্রসঙ্গে	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
ঐ	অপরাধ জগতের ভাষা : ধ্বনিতত্ত্ব	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
	বিজ্ঞান	
অমল দাশগুপ্ত	একটি পৌরাণিক উপখ্যানে সৃষ্টির বিবরণ ঃ বিজ্ঞান প্রসঙ্গ	ফাল্গুন, ১৩৬৮
ঐ	পার্থিব পদার্থের রূপ ও স্বরূপ	শ্রাবণ, ১৩৭৬
ঐ	বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী	শ্রাবণ, ১৩৬৯
অশোককুমার দত্ত	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	কার্ত্তিক, ১৩৬৮
আলেকজান্দ্রফ, এ	বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র ; অনুবাদক-সিদ্ধেশ্বর সেন	আষাঢ়, ১৩৭৪
জ্যোতির্ময় গুপ্ত	ইয়েল নাবালিকার এবং অতঃপর ঃ বিজ্ঞান প্রসঙ্গ	আষাঢ়, ১৩৭১
নৃপেন্দ্র গোস্বামী	কার্ল পপার এবং খণ্ডনবাদ ঃ ডিডাকটিভ বা আরোহ পদ্ধতি	পৌষ, ১৩৭০
শচীন্দ্রনাথ বসু	সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ঃ পুস্তক পরিচয আঃ পুঃ : বিশ্ববিজ্ঞান—কমলেশ রায	মাঘ, ১৩৭২
সতীশরঞ্জন খাস্তগীর	বিজ্ঞানীর জগৎ	আশ্বিন, ১৩৭১
হলডেন, জে বি এস	অপ্রত্যাশিতের প্রত্যাশা	আশ্বিন, ১৩৬৮
	জ্যোতির্বিজ্ঞান	
জ্যোতির্ময় গুপ্ত	ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের অবদান	কার্ত্তিক, ১৩৭০
শংকর চক্রবর্তী	আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি সমস্যা : এ সি বি লোভেল লিখিত 'দি ইন্ডিভিজুয়াল এ্যান্ড দি ইউনিভার্স' এবং জগজিত সিং লিখিত গ্রেট আইডিয়াল এ্যান্ড থিয়োরিজ অব মডার্ন কসমোলজি গ্রন্থদ্বয়ের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
শঙ্কর চক্রবর্তী	শুকতারার সন্ধানে	বৈশাখ, ১৩৭৬
	পদার্থবিজ্ঞান আপেক্ষিকতাবাদ	
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়	মার্কসীয় তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদ	আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৭২
জীবেন সিদ্ধান্ত	আপেক্ষিকতাবাদ কি কোনো বিপ্লব	চৈত্র, ১৩৬৯
	বিজ্ঞান প্রসঙ্গ	
কপিল ভট্টাচার্য	শক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যা	বৈশাখ, ১৩৭০
	কোয়ান্টাম বলবিদ্যা	
সূর্যেন্দুবিকাশ রায়	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ : বিডনিক, ডি- কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পাদনা-জয়ন্ত বসু	পৌষ, ১৩৭৮
	পরমাণু বিজ্ঞান	
অমল দাশগুপ্ত	পরমাণু ও অতি পরমাণু : বিজ্ঞান প্রসঙ্গ	পৌষ, ১৩৭১
বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়	পরমাণবিক বাস্তবতা	অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
	ইঞ্জিনীয়ারিং	
	মহাকাশ অভিযান	
দিলীপ বসু	চন্দ্রাভিযান : বিজ্ঞান প্রসঙ্গ	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭১
শঙ্কর চক্রবর্তী	চাঁদে অভিযান : বিজ্ঞান প্রসঙ্গ	আষাঢ়, ১৩৭৬
ঐ	পৃথিবীর চাঁদ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৩
	শিল্পকলা	
	নন্দন তত্ত্ব	
অন্নদাশঙ্কর রায়	যেমনটি তেমনটি	ভাদ্র, ১৩৭৫
অরুণ সেন	শিল্প ও বিপ্লব , আর্ট এ্যান্ড রেভোলিউশন : আর্নস্ট ন্যাজ ভেস্টনি এবং দ্য রোল অব দি আর্টিস্ট ইন	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	দি ইউ এস এস আর : জন রার্গাব এর গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা	
অশোক রুদ্র	শিল্পীর স্বাধীনতা	আশ্বিন, ১৩৭১
অসীম রায়	ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৪
নীরেন্দ্রনাথ রায়	লুনাচারস্কির নন্দনতত্ত্ব	কার্ত্তিক, ১৩৭৩
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	আধুনিক নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৭
বিষ্ণু দে	শিল্পের অভিজ্ঞতা	শ্রাবণ, ১৩৬৯
শঙ্কর ভট্টাচার্য	বিমূর্ত শিল্প ও শিল্পীর স্বাধীনতা	বৈশাখ, ১৩৭০
সরোজ আচার্য	শিল্পীর দায়িত্ব	আশ্বিন, ১৩৬৯
সবোজকুমার ভৌমিক	ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সৃজনাত্মক শিল্পকলা	পৌষ, ১৩৭৭
সিদ্ধেশ্বর সেন	শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায	আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৭৭
	ভারতীয় শিল্পকলা	
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	ভারতীয় শিল্পী ও সমকালীন শিল্প	চৈত্র, ১৩৬৯
স্বরূপ গুপ্ত	কলাকর্ম : বৎসরান্তিক ফসল	মাঘ, ১৩৬৯
	কারু-শিল্প	
ধনঞ্জয় দাশ	ডোকরা শিল্পকলার পুনরোজ্জীবন	চৈত্র, ১৩৭০
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়	হাতের কাজ : পুস্তক পবিচয় আঃ পুঃ কাঠেব কাজ-লক্ষ্মীশ্বব সিংহ	ভাদ্র, ১৩৭১
	ভাস্কর্য	
প্রভাস সেন	সাম্প্রতিক কালেব ব্রিটিশ ভাস্কর্য	পৌষ, ১৩৭২
	মন্দিব ভাস্কর্য	
অশোক মিত্র	ভারতীয় মন্দিবে আলিঙ্গন ভাস্কর্য	পৌষ, ১৩৭২

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
গোপাল হালদার	পুস্তক পরিচয়	পৌষ, ১৩৭২
	আঃ পুঃ বাঁকুড়ার মন্দির	
	—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
	উড়িষ্যার দেবদেউল	
	-মনোমোহন অধিকারী	
সুমত বন্দ্যোপাধ্যায়	শিল্পে অবগুণ্ঠিতা	পৌষ, ১৬৭২
	চিত্রকলা	
পরিতোষ সেন	আধুনিক চিত্র শিল্প	পৌষ, ১৩৭২
	চিত্রকলা-প্রদর্শনী	
তরুণ সান্যাল	চিত্র-প্রদর্শনী	পৌষ, ১৩৬৯
ধনঞ্জয় দাশ	চিত্র প্রদর্শনী প্রসঙ্গ	মাঘ, ১৩৬৯
রবীন্দ্র মজুমদার	সাম্প্রতিক শিল্পচিন্তা বিষয়ক	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭১
	চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী	
	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	গগনেন্দ্রনাথ	আশ্বিন, ১৩৭১
	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	
মণি জানা	'চিত্র ভাষা ও সমকালীন শিল্পী' —দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের উপর আলোচনা	পৌষ, ১৩৭০
রমেন্দ্রনাথ দাস	'চিত্র ভাষা ও সমকালীন শিল্পী' দেবব্রত মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা	অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
	নন্দলাল বসু	
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	আচার্য নন্দলাল : কানাই সামন্ত লিখিত 'শ্রীনন্দলাল বসু' গ্রন্থের উপর আলোচনা	শ্রাবণ, ১৩৭০
শান্তা দেবী	নন্দলাল বসু	বৈশাখ, ১৩৭৩
	বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা	

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
হেম শর্মা	কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
	বিদেশী শিল্পকথা	
	লাতিন আমেরিকা	
চিন্মোহন সেহানাবীশ	লাতিন আমেরিকার নতুন শিল্পী সমাজ	আশ্বিন, ১৩৬৯
	বিদেশী চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী	
	এঞ্জেলো, মাইকেল	
প্রভাস সেন	মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্প ও শিল্পচিন্তা	অগ্রহায়ণ, ১৩৭১
বর্মা, রোলা	ইতালিয়ান শিল্পে মাইকেল এঞ্জেলোর প্রভাব ; অনু: কৌস্তভকান্তি মুখোপাধ্যায়	মাঘ, ১৩৭২
	ফরাসি চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী	
	ব্রাক, জর্জ	
রঞ্জন বুদ্র	জর্জ ব্রাক	অগ্রহায়ণ, ১২৭০
	বিনোদন	
	সংগীত	
	সংগীততত্ত্ব	
গুরুদাস ভট্টাচার্য	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ লৌকিক ও রাগ সংগীতের উৎস সন্ধানে-অতুলরঞ্জন সরকার	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
সুভাষ সেন	রুচিগঠনের পক্ষে : সঙ্গীত প্রসঙ্গ	শ্রাবণ, ১৩৭৫
ঐ	সংগীতের স্বীকৃতি	শ্রাবণ, ১৩৭৪
	ভারতীয় সংগীত-ইতিহাস	
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	সংগীত স্মৃতি ঃ ইংরেজি ভাষায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত সংগীত-স্মৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত রচনার	পৌষ, ১৩৭২

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	অনুবাদ অনুঃ চিন্মোহন সেহানবীশ	
প্রফুল্লকুমার দাস	সংগীতঃ সেকাল ও একাল	কার্ত্তিক, ১৩৭১
	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা-রাজ্যেশ্বর মিত্র সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু— দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	
রাজ্যেশ্বর মিত্র	ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি কি আধ্যাত্মিক	পৌষ, ১৩৭২
	শাস্ত্রীয় সংগীত ও সংগীত শিল্পী	
	বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে	
দিলীপ বসু	পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে	পৌষ, ১৩৭২
দিলীপ বসু	পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে	পৌষ, ১৩৭২
	বাংলা গান	
পদ্মনাভ দাশগুপ্ত	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ হাজার বছরের বাংলা গান— প্রভাতকুমার গোস্বামী (সঃ)	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
সুহাস চৌধুরী	আধুনিক বাংলা গানের আর্টের দিক ও জনপ্রিয়তা	মাঘ, ১৩৬৯
	চলচ্চিত্র-আলোচনা	
ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঙলা চলচ্চিত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট ঃ চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ	শ্রাবণ, ১৩৭৫
ঋত্বিককুমার ঘটক	ছবিতে শব্দ	পৌষ, ১৩৭২
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়	চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ	শ্রাবণ, ১৩৭৭
ঐ	বাংলা চলচ্চিত্র—দৈন্যের পটভূমি ও সম্ভাবনা	মাঘ, ১৩৭১
কুমার সোম	চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ	মাঘ, ১৩৭১

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
জিষ্ণু দে	'মধুর জীবন' ঃ চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ	ফাল্গুন, ১৩৬৮
দিলীপ মুখোপাধ্যায়	আধুনিক চেক চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ	বৈশাখ, ১৩৭৬
ঐ	বিষুর পুষ্প ঃ ওজু	পৌষ, ১৩৭২
পরিমল মুখোপাধ্যায়	মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের চলচ্চিত্র	পৌষ,-মাঘ ১৩৭৬
পুনপুন মুখোপাধ্যায়	রুনাকর সুবচনী	চৈত্র, ১৩৭৫
মিনু রায়	গুরু-গা-বাবা ঃ চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ	কার্ত্তিক, ১৩৭৬
মৃগাঙ্কশেখর রায়	ফরাসি নবতরঙ্গ ও জ্যাক দেমি	মাঘ, ১৩৭২
মৃণাল সেন	চলচ্চিত্র ঃ দেশে বিদেশে, পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ ঃ চলচ্চিত্র ঃ স্মরণীয় স্রষ্টা—প্রভাতকুমার দত্ত	
ঐ	চলচ্চিত্রে সমকালীনতা	পৌষ, ১৩৭২
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	চলচ্চিত্র কথা	শ্রাবণ, ১৩৭৬
ঐ	পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৬৪	চৈত্র, ১৩৭০
সত্যেশ রায়	বুশী বিস্ময় ঃ আন্নালিয়ে, ও এ্যাণ্ড ফুলডাইক পরিচালিত জার্মানি তথ্যচিত্র 'দি রাশিয়ান মিরাকল'	অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
সমীর রায়	কলকাতায় উৎসবে দেখা কয়েকটি ফরাসি চলচ্চিত্র	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৪
	চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রকার আন্তোনিওনি, মাইকেল এঞ্জেলো	
দিলীপ মুখোপাধ্যায়	আন্তোনিওনি-চিন্তা ঃ পিয়ের লেপ্রো লিখিত 'মাইকেল এ্যাঞ্জেলো অ্যান্টোনিওনি অ্যান ইনট্রোডাকশন' গ্রন্থের উপর আলোচনা অনুবাদক-স্কট সুনির্ভার	ভাদ্র, ১৩৭৩
	সত্যজিৎ রায়	
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'	বৈশাখ, ১৩৭৩

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচযেব প্রকাশকাল
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	'নায়ক' প্রসঙ্গে : পাঠকগোষ্ঠি ; করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাব উপব সমালোচনা	ভাদ্র, ১৩৭৩
ধ্রুব গুপ্ত	সত্যজিৎ বায়ের 'চারুলতা'	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১
মানব মিত্র	'নায়ক' প্রসঙ্গে ; পাঠক গোষ্ঠি।	ভাদ্র, ১৩৭৩
শান্তি বসু ও জিষ্ণু দে	কাঞ্চনজঙ্ঘা : দুটি মত	শ্রাবণ, ১৩৬৯
সত্যজিৎ রায়	চারুলতা প্রসঙ্গে	অগ্রহায়ণ, ১৩৭১
ঐ	মহানগর	আশ্বিন, ১৩৭০
ঐ	সাক্ষাৎকাব : গ্রহীতা-শমীক বন্দ্যোপাধ্যায	পৌষ, ১৩৭২
	নাটক ও নাট্য আন্দোলন	
	নাট্যতত্ত্ব	
উমানাথ ভট্টাচার্য	নাটক বিষযে কযেকটি কথা : নাট্যপ্রসঙ্গ	শ্রাবণ, ১৩৭৫
কুমার রায়	সৎনাটকেব অভিধা	পৌষ, ১৩৭২
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত	নাট্য সমালোচনার মানদণ্ড	শ্রাবণ, ১৩৭২
	বাংলা নাটক	
অশোক মুখোপাধ্যায়	রাত্রি	বৈশাখ, ১৩৭৩
উমানাথ ভট্টাচার্য	রঙ্গ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৩
ঐ	সত্যকাম	ভাদ্র, ১৩৭৫
কপিল ভট্টাচার্য	মানব মনেব নাটক : পুস্তক পবিচয	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৪
	আঃ পুঃ : সম্রাট ও অপারেশন ফার্স্টস—ধীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায	
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায	ভাসানো ভেলায	ভাদ্র, ১৩৭২
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মেঘের আড়ালে সূর্য	পৌষ, ১৩৭৭

লেখক	বিষয় ও আখ্যা–শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
বিজন ভট্টাচার্য	চলো সাগরে	চৈত্র, ১৩৭৫ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩৭৬
ঐ	জতুগৃহ	কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩৬৯
বিভাস চক্রবর্তী	ভিয়েতনাম	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬
মোহিত চট্টোপাধ্যায়	রাক্ষস	আশ্বিন, ১৩৭৬
লোকনাথ ভট্টাচার্য	ঠাকুর যাবে বিসর্জন	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬
	বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়	
অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	কয়েকটি অভিনয় ঃ নাট্য প্রসঙ্গ	ফাল্গুন, ১৩৬৮
অজিষ্ণু ভট্টাচার্য	তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার', বহুরূপীর পুনঃ প্রযোজনা	বৈশাখ, ১৩৭৩
অশোক মুখোপাধ্যায়	পেশাদারির গড্ডলিকায় বরুণ রায় প্রয়োজিত 'রঙ্গিনী' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে	শ্রাবণ, ১৩৭৪
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়	নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা' নাট্য প্রসঙ্গ	পৌষ, ১৩৭৭
উমানাথ ভট্টাচার্য	'অনামিকা'র 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাট্য প্রসঙ্গ	বৈশাখ, ১৩৭৬
কান্তি সেন	দুটি নতুন নাটক ঃ 'সমাধান' ও 'সামান্য অসামান্য'-ঋত্বিক গোষ্ঠি প্রযোজিত	
কেয়া চক্রবর্তী	দেবী গর্জন ঃ নাট্যপ্রসঙ্গ	
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	নাট্য সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী ঃ বাদল সরকারের নাটক 'বাকি ইতিহাস'	শ্রাবণ, ১৩৭৪
গোপাল হালদার	'বহুরূপী'র 'রাজা অয়েদিপউস'	ভাদ্র, ১৩৭১
ধ্রুব গুপ্ত	'নান্দীকার' প্রযোজিত	আষাঢ়, ১৩৭১

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	'নাট্যকাবের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' ঃ	
	নাট্যপ্রসঙ্গ	
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	বাদল সরকারেব 'বাকি ইতিহাস'-বহুরূপী প্রযোজিত	আষাঢ়, ১৩৭৪
সত্যপ্রিয় ঘোষ	পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্য সংস্থার নবতম নাটক কল্মাষপদ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
স্বর্ণেন্দু রায় চৌধুরী	থিয়েটার ইউনিট প্রযোজিত 'জলাভূমি'	কার্ত্তিক, ১৩৭৬
	বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনেতা	
	শিশিবকুমার ভাদুড়ী	
শম্ভু মিত্র	শিশিরকুমাব প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র সাক্ষাৎকাব ঃ গ্রহীতা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	পৌষ, ১৩৭৩
	বাংলা নাটক ও নাট্যকাব	
	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
বঙ্কিমচন্দ্র দাস	নাট্যকাব দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত	দ্বিজেন্দ্রলাল ও শেক্সপীযব	অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
	মধুসূদন দত্ত	
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	পুস্তক পাবিচয় আঃ পুঃ ঃ নাট্যবোধ ও নাট্যকাব মধুসূদন-ববীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪
	বিদেশী নাটক ও নাট্যকাব	
	ওয়েস্কাব আর্নল্ড	
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায	আর্নল্ড ওযেস্কাবেব নাটক	অগ্রহাযণ, ১৩৬৮
	শেক্‌শপীয়র, উইলিয়ম	

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
অমলেন্দু বসু	শেক্সপিয়রের কাল	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১
গোপাল হালদার	শেক্সপীয়র-সাক্ষাৎ	বৈশাখ, ১৩৭১
নীরেন্দ্রনাথ রায়	বাঙালীর শেক্সপীয়র-প্রেম	ঐ
পূর্ণচন্দ্র বসু ও অন্যান্য	উনিশ শতকের চোখে শেক্সপীয়র অন্য লেখকগন : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বৈশাখ, ১৩৭১
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	মঞ্চে শেক্সপীয়র	ঐ
ঐ	শেক্সপীয়র : পূর্বাভাস	ঐ
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	বাহিরে যার হাসির ছটা	পৌষ, ১৩৭১
বিষ্ণু দে	শেক্সপীয়র ও বাংলা	ঐ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শেক্সপীয়র স্মরণে	ঐ
রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত	উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা	ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, ১৩৭১
ঐ	বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব	বৈশাখ, ১৩৭১
শচীন বসু	ভারতে শেক্সপীয়র চর্চা পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ : শেক্সপীয়রের চতুর্শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত পুস্তক প্রদর্শনী ও জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রকাশিত শেক্সপীয়র ইন ইন্ডিয়া	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১
শীতাংশু মৈত্র	বাঙলায় শেক্সপীয়র চর্চা	বৈশাখ, ১৩৭১
সুধাংশু ঘোষ	শেক্সপীয়রের রূপকল্প প্রসঙ্গে	ঐ
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য	শেক্সপীয়রের সনেট অন্যান্য লেখকগণ : বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ	ঐ

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও প্রমোদ মুখোপাধ্যায়	
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	শেক্সপীয়র অনুবাদের সপক্ষে	ঐ
হাউস, হমফ্রে	শ্যামা	ঐ
	মঞ্চ শিল্প	
খালেদ চৌধুরী	মঞ্চ সজ্জা	পৌষ, ১৩৭২
তাপস সেন	থিয়েটারে নতুন আলো	ঐ
	ভারতীয় নৃত্য ও নৃত্য শিল্পী অমলাশঙ্কর	
অমলাশঙ্কর	সাক্ষাৎকার : গ্রহীতা-শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ

লেখক	বিষয় ও আখ্যাশিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	সাহিত্য	
	সাহিত্যতত্ত্ব	
অসীম রায়	নৈতিক ঔচিত্যবোধ ও সৌন্দর্য বোধ	ভাদ্র, ১৩৭১
ঐ	শিল্পীর স্বধর্ম	বৈশাখ, ১৩৭০
কেয়া চক্রবর্তী	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ : ফোর্ড, হিউ, ডি ঐ পোয়েটস্ ওয়ার : ব্রিটিশ পোয়েটস্ অ্যান্ড দি স্পেনিশ সিভিল ওয়ার	আষাঢ়, ১৩৭৪
গৌতম সান্যাল	শিল্প, স্বাধীনতা ও সমাজ : শান্তি বসু লিখিত 'শিল্প স্বাধীনতা ও সমাজ' গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
দেবেশ রায়	সাম্প্রতিক সাহিত্য : হিরোশিমা : ভস্মস্মৃতি	ফাল্গুন, ১৩৬৮
নজরুল ইসলাম	বর্তমান বিশ্বসাহিত্য	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
নারায়ণ চৌধুরী	লেখকদের শ্রেণী বিচার	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
বীরেন্দ্র নিয়োগী	যান্ত্রিকতা, যন্ত্রণা ও হাল আমলেব সাহিত্য	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
ভাইত কোডিচ, এন	লেনিন ও শিল্প-	চৈত্র, ১৩৭৫
বঞ্জন রুদ্র	বিষযবস্তুব সংকট	পৌষ, ১৩৭২
লোকনাথ ভট্টাচার্য	সাহিত্যেব শুকনো ভূমিখণ্ড	বৈশাখ, ১৩৭৩
সত্যপ্রিয ঘোষ	সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্য কি প্রগতিশীল	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
সত্যেশ বায	শিল্প সাহিত্য ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিব দৃষ্টিভঙ্গী	চৈত্র, ১৩৬৯
সত্যেন্দ্রনাবাযণ মজুমদাব	ম্যাক্সিম গোর্কীর দৃষ্টিতে শিল্পী ও সমাজেব সম্পর্ক	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
সুধ্যংশুরঞ্জন ঘোষ	সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	অগ্রহাযণ, ১৩৬৮
	বিশ্ব সাহিত্য	
সবোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা	শ্রাবণ, ১৩৭২
	প্রাদেশিক সাহিত্য	
চিন্ময় গুহঠাকুরতা	পুস্তক পবিচয় আঃ পুঃ চিংড়ি-ডাকাথি শিবশঙ্কব পিল্লাই ; অনুঃ বোম্মানা বিশ্বনাথন্ ও নীলীমা আব্রাহাম উনিশ বিঘা দুই কাঠা ফকিরমোহন সেনাপতি , অনুঃ মৈত্রী শুক্লা অশ্রুত এক বাগিণী (সিন্ধী) —সুন্দবী আসমান দাস উত্তম চন্দ্রানী ; অনুঃ বোম্মানা বিশ্বনাথন্	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	উর্দু কাব্য ও কবি	
	জনমেজয় মিত্র আর্মান	
শান্তিময় ভট্টাচার্য	বাঙালী উর্দু কবি জনমেজয় মিত্র আর্মান	আষাঢ়, ১৩৭৪
	উর্দু গল্প	
কৃষণ চন্দর	শুধু ফুল	অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
	হাত চুরি	আশ্বিন, ১৩৭৪
	অনুঃ জ্যোতিভূষণ চাকী	
	ওড়িয়া গল্প	
ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী	শিকার,	আশ্বিন, ১৩৭৪
	অনুঃ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত	
	প্রতিবেশী সাহিত্য	
	নেপালী কবি ও সাহিত্যিক	
	–পণ্ডিত লোকনাথ শর্মা	
চিন্ময় ঘোষ	কবি শিরোমণি	আষাঢ়, ১৩৭৪
	পণ্ডিত লোকনাথ শর্মা পোড়োযাল	
	বাংলা সাহিত্য	
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান	কার্ত্তিক, ১৩৭০
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	পত্র ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়কে তার ইংরেজিতে লেখা 'বেঙ্গলী লিটারেচার' বইটির খসড়া সম্পর্কে	ভাদ্র, ১৩৭২
	বাংলা লোকসাহিত্য	
অনিমেষ পাল	পুস্তক পরিচয়	আষাঢ়, ১৩৭৯
	আঃ পুঃ	
	বেঙ্গল ফোক ব্যালাডস ফ্রম মাইমেনসিং এ্যান্ড দ্য প্রব্লেম অফ্ দেয়ার অথেনটিসিটি—	
	দুশান জবাভিতেল	

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
জবাভিতেল, দুশেন	লোককবিতা ও ধ্রুপদী বাংলা সাহিত্য : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধ	ভাদ্র, ১৩৭১
বিধু চক্রবর্তী	'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রসঙ্গে : পাঠকগোষ্ঠি	ভাদ্র, ১৩৭১
বাম বসু	লোক সাহিত্যে বর্ষা : শঙ্কব সেনগুপ্ত লিখিত 'বেন ইন ইণ্ডিয়ান লাইফ এ্যাণ্ড লোব' গ্রন্থের উপব আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
	বাংলা শিশু সাহিত্য	
শিবানী রায় চৌধুরী	শিশু সাহিত্য ও বর্তমান বাঙলা দেশ	বৈশাখ, ১৩৭৬
	বাংলা কাব্য	
কৃষ্ণ ধব	এ যুগের কবিতা	শ্রাবণ, ১৩৬৮
তরুণ সান্যাল	চিত্রকল্পের সেই বিস্মৃত প্রায আন্দোলন	শ্রাবণ, ১৩৬৮
বার্ণিক রায়	এক শো বছরেব বাংলা কবিতা	শ্রাবণ, ১৩৬৮
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	আধুনিক বাংলা কবিতা	আশ্বিন, ১৩৬৯
রাম বসু	কবিতা প্রসঙ্গ	শ্রাবণ, ১৩৬৮
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিতার রূপ ও সমালোচনাব ভাষা	আশ্বিন, ১৩৭১
ঐ	দীর্ঘ কবিতা ও চিত্রকল্পেব সংলগ্নতা	আশ্বিন, ১৩৬৮
	বাংলা কাব্য ও কবি	
অরুণ সেন	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ স্মৃতি বিস্মৃতিব চেয়ে কিছু বেশী—যুগান্তর চক্রবর্তী	বৈশাখ, ১৩৭৬

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	সই ময়ূর মন-	
	লোকনাথ ভট্টাচার্য	
	অমিয় চক্রবর্তী	
চিত্ত ঘোষ	অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা	শ্রাবণ, ১৩৬৮
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়	সাম্প্রতিক সাহিত্যের স্বরূপ ঃ অমিয় চক্রবর্তী লিখিত 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
	অরুণ মিত্র	
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	উৎস থেকে উজানে ঃ অরুণ মিত্র লিখিত 'ঘনিষ্ঠ তাপ' কাব্য গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ভবতোষ দত্ত	দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য সাধনা	শ্রাবণ, ১৩৭২
	দ্বিজেন্দ্র লাল রায়	
ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানী	দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি	আশ্বিন, ১৩৭১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	হাসির গান ঃ অপ্রকাশিত রূপান্তর	আশ্বিন, ১৩৭১
	নজরুল ইসলাম	
আব্দুল আজিজ আল-আমান	কবি বিদ্রোহী প্রসঙ্গে	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১
তরুণ সান্যাল	সত্তর বছরে নজরুল ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
	বিষ্ণু দে	
অরুণ সেন	বিষ্ণু দে ও তাঁর রচনাবলী	আষাঢ়, ১৩৭৬
অসীম রায়	বিষ্ণু দে'র পরবর্তী অধ্যায়	বৈশাখ, ১৩৭৬
	মধুসূদন দত্ত	
দেবদত্ত নিয়োগী	মধুসূদনের কবিতা	শ্রাবণ, ১৩৬৮
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রথম আধুনিক কবি ঃ পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ মধুসূদন ও উত্তরকাল	ভাদ্র, ১৩৭১

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
	সম্পাদনা-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
রাম বসু	সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতা	শ্রাবণ, ১৩৬৯
	বাংলা গল্প-উপন্যাস	
অজয় গুপ্ত	কিংবদন্তির নুপুর	ভাদ্র, ১৩৭১
অজিত মুখোপাধ্যায়	ডাক্তার তারকেশ্বর ও মানুষের ব্রেন	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭১
ঐ	বন্দুক	আশ্বিন, ১৩৭৫
ঐ	স্বদেশ রঞ্জন	আশ্বিন, ১৩৭৪
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	আগুন জ্বালাবার গল্প	ভাদ্র, ১৩৭৫
ঐ	কাফের	আশ্বিন, ১৩৭৪
ঐ	দুর্ঘটনা	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
ঐ	সাদা ঘোড়া	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
ঐ	সীতার বনবাস	আষাঢ়, ১৩৭৪
অমরেশ রায়	একটি আঙ্কিক সমস্যা ও চাঁদ	পৌষ, ১৩৭১
অমল দাশগুপ্ত	অভিযান	আশ্বিন. ১৩৭১
ঐ	একটি গোয়েন্দা গল্প	ভাদ্র, ১৩৭১
ঐ	না-হওয়া গল্প	আশ্বিন, ১৩৭৪
ঐ	নিয়তি	ভাদ্র, ১৩৭৫
ঐ	মাছ খাওয়ার গল্প	আশ্বিন, ১৩৬৯
ঐ	ব্যাম ফোবিংকাম	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০
ঐ	শেষের আগে	আশ্বিন, ১৩৬৮
ঐ	সুতোর টানে	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
অমলেন্দু চক্রবর্তী	অবিরত চেনা মুখ	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
ঐ	ইছামতী বহমান	ভাদ্র, ১৩৭৫
ঐ	একটি লৌকিক গল্প	বৈশাখ, ১৩৭৬
ঐ	কিংবদন্তি	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
ঐ	পঞ্চাশটি মানব শিশু ও একটি দেবদূত	বৈশাখ, ১৩৭৬
অমিয়ভূষণ মজুমদার	এপস্ এ্যান্ড পিকক্	ভাদ্র, ১৩৭২
অমৃত রায়	একটি কালো মেয়ের কথা : হিন্দি থেকে অনুবাদ : সুবোধ চৌধুরী	আশ্বিন, ১৩৭৪
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়	মা-জননী	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬
অরূপ বসু	দেবদাবু, ডবলডেকার এবং বিনোদ	ভাদ্র, ১৩৬৮
অশোককুমার সেনগুপ্ত	ছাগল	কার্ত্তিক, ১৩৭৬
অসিত ঘোষ	ক্রমাগত করতালি	চৈত্র, ১৩৭৫
	পদাতিক	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
অসীম রায়	ধোঁয়া-ধুলো নক্ষত্র	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
ঐ	শ্রেণী শত্রু	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
আশিস ঘোষ	বিবর্ণ	কার্ত্তিক, ১৩৭১
আশিস রায়	স্বপ্ন	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৩
আশিস সেনগুপ্ত	নীলকণ্ঠ পাখির পালক	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৪
ঐ	হ্যাট সোমরা ও মাবলির গল্প	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬
আশুতোষ সরকার	একালের বিকাল	আশ্বিন, ১৩৭৪
ঐ	পোকা	শ্রাবণ, ১৩৭৪
কার্ত্তিক লাহিড়ী	যে কোন লোকের গল্প	শ্রাবণ, ১৩৭৫
কালিদাস দত্ত	স্বর্গারোহণ	মাঘ, ১৩৭০
কুমারেশ ভট্টাচার্য	সীমান্তকাল	আষাঢ়, ১৩৭৬
কুশল লাহিড়ী	মানুষ মারলে এখন তদন্ত হয়না	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য	নির্বিন্ধ শিকার	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৩
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	মানসপুত্র	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৩
ঐ	হাতি আর পোকা	আশ্বিন, ১৩৭৪
গুণময় মান্না	অহোরাত্র	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
গোপাল হালদার	অঘটন ঘটল	ভাদ্র, ১৩৭৫
ঐ	উপহার	আশ্বিন, ১৩৭১
ঐ	ঘেরাও ও ধরাও	আশ্বিন, ১৩৭৪
ঐ	জিন্দাবাদ	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
ঐ	প্রথম অশ্রু	ভাদ্র, ১৩৭২
গোলাম কুদ্দুস	পানপাত্র	আশ্বিন, ১৩৭০
চণ্ডী মণ্ডল	ইতিহাস সংবাদ	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৬
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	খুনীরা খুনের জায়গায়	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
ঐ	ঢাকীরা ঢাক বাজায়	ভাদ্র, ১৩৭২
ঐ	পক্ষীরাজ	ভাদ্র, ১৩৭৫
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	মাজু	ফাল্গুন, ১৩৭৭
ঐ	মুনিয়া	ভাদ্র-আশ্বিন' ১৩৭৬
জ্যোৎস্নাময় ঘোষ	শহর নৈহাটির বিদূষক	আশ্বিন, ১৩৭৩
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত	দূর যাত্রা	বৈশাখ, ১৩৭৬
দিলীপ সেনগুপ্ত	অরাজনৈতিক	চৈত্র, ১৩৭৬
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	হওয়া-না-হওয়া	আশ্বিন, ১৩৭৪
দেবেশ রায়	একটি ফসিল চিত্র	ভাদ্র, ১৩৭২
ঐ	জয়যাত্রায় যাও হে	চৈত্র, ১৩৭৬
ঐ	তিন পুরুষের উপাখ্যান	আশ্বিন, ১৩৭১
ঐ	দাহন বেলা	আশ্বিন, ১৩৬৮
ঐ	ধর্না	আশ্বিন, ১৩৭৪
ঐ	নিজের সঙ্গে আলাপ	শ্রাবণ, ১৩৭৪
ঐ	বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব	মাঘ, ১৩৬৯
ঐ	বেঁচে বর্তে থাকা	ভাদ্র, ১৩৭৫
ঐ	মিলন পিয়াসী	আশ্বিন, ১৩৭৩
ঐ	যযাতি	মাঘ-চৈত্র, ১৩৭১ মাঘ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৬

লেখক	বিষয ও আখ্যা-শিরোনাম	পবিচযেব প্রকাশকাল
		জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় পৌষ-মাঘ ১৩৭৪
ঐ	যুযুৎসু	আশ্বিন, ১৩৭০
ননী ভৌমিক	অন্যবিধ	আশ্বিন, ১৩৬৮
নবারুণ ভট্টাচার্য	ভা-সান	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৪
ঐ	সাথর্ক জনম মাগো	পৌষ, ১৩৭৭
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	বঞ্চনা	আশ্বিন, ১৩৭০
ঐ	বাসি ফুলেব মালা	বৈশাখ, ১৩৭৬
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	দেবদাস এবং তিতিব	ভাদ্র, ১৩৭৫
ঐ	ফুল	আশ্বিন, ১৩৭০
ঐ	সাঁকো	আশ্বিন, ১৩৬৮
নির্মল চট্টোপাধ্যায	গ্রেফতাব	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
নীরদ ভট্টাচার্য	মদন বাঘার মা ও শকুন	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৪
পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায	পালবাবু	শ্রাবণ, ১৩৭৪
প্রিযতোষ মুখোপাধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণেব পট	আষাঢ়, ১৩৭০
ঐ	সীমালেখা	আশ্বিন, ১৩৭৪
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	হাঁদুই রুমাল	ভাদ্র, ১৩৭২
বল্লভী বক্সী	রাজোদ্রোহী ঘোড়া	চৈত্র, ১৩৭৬
বাণীব্রত চক্রবর্তী	বানীব কাছে পাচ্চুজা	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	কল্পনা চায় রূপ	আশ্বিন, ১৩৬৮
বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়	খুসনার দুর্ভাগা আধিযার চাষী	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৭
বীরেন্দ্র নিযোগী	একটি ফুলের জন্য	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭
মতি নন্দী	বয়স	ভাদ্র, ১৩৭২
মহাশ্বেতা দেবী	ম্যাডোনা	আশ্বিন, ১৩৭৪
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	অপ্রকাশিত উপন্যাসের খসড়া	আশ্বিন, ১৩৭০
মিহিব পাল	জীবনের মুখ	আষাঢ়, ১৩৭১
মিহির সেন	আততাযী	শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৭

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়েব প্রকাশকাল
ঐ	একটি তুচ্ছ ঘটনার পটভূমি	ভাদ্র—আশ্বিন, ১৩৭৬
ঐ	একটি ধর্ষণেব মামলা	আশ্বিন, ১৩৭৪
ঐ	মার্জাব হত্যার উপাখ্যান	ভাদ্র, ১৩৭৫
ঐ	শহব সজ্জা	পৌষ মাঘ, ১৩৭৬
যশোদাজীবন ভট্টাচার্য	প্রাণনাথের সন্তাপ ও শান্তি	আশ্বিন, ১৩৭৪
যুবনাশ, ছদ্ম (মনীশ ঘটক)	রাজিন্দর	আশ্বিন, ১৩৭৪
রণজিৎ সিংহ	চিড়িয়াখানাব পশুরাজ	কার্ত্তিক, ১৩৬৯
রমানাথ রায়	ছিল	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৩
ঐ	দুর্বোধ্য	অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
ঐ	সামনের সাতাশ	ভাদ্র, ১৩৭২
রাজশেখব দত্ত	বরফেব আগেব দিন	আশ্বিন,-কার্ত্তিক, ১৩৭৭
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	অন্নদামঙ্গল	মাঘ, ১৩৭২
ঐ	খুনী	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
ঐ	খোকন গেছে কার নায	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১
ঐ	প্রেম কাহিনী	আশ্বিন, ১৩৭৪
ঐ	মজুত উদ্ধাব	ভাদ্র, ১৩৭২
ঐ	লক্ষ্মীর বাস বাণিজ্যে	আশ্বিন, ১৩৭১
ঐ	শশীকান্তির আজকের পালা	আশ্বিন, ১৩৭০
ঐ	সওয়াল	আশ্বিন, ১৩৭৩
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	মৃণালকান্তির আত্মচরিত	আশ্বিন, ১৩৭০
ঐ	যোগসূত্র	ভাদ্র, ১৩৭২
সত্য গুপ্ত	মাদারীকা খেল	আশ্বিন, ১৩৬৯
সত্যপ্রিয় ঘোষ	শিয়াল	ভাদ্র—আশ্বিন, ১৩৭৬
সমর রায় চৌধুরী	বিধুশেখর মন্ত্রী হলেন	শ্রাবণ, ১৩৭৪
সমরেশ বায়	ফেউ	কার্ত্তিক, ১৩৭০
সমরেশ বসু	ভগবতী	আশ্বিন, ১৩৭৬
ঐ	মাঝখানে	আশ্বিন, ১৩৬৯

লেখক	বিষয় ও আখ্যা-শিরোনাম	পরিচয়ের প্রকাশকাল
ঐ	লড়াই	আশ্বিন, ১৩৬৮
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	গোলাপ হয়ে উঠবে	চৈত্র, ১৩৬৯ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৭০, আষাঢ়, ১৩৭১
সত্যেন সেন	ধান চোর	ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৭৭
সুজিত মুখোপাধ্যায়	সামটোটাল	কার্ত্তিক, ১৩৭৩
সুনীল চট্টোপাধ্যায়	সাগরে	আশ্বিন, ১৩৬৯
সুবিমল মিত্র	রক্ত	আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৭৭
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	ফুলের লোকালে ফেরা	আশ্বিন, ১৩৭১
সুভাষ সেন	আয়না	ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৪
সুরজিৎ বসু	পরকলা	আশ্বিন, ১৩৭৪
সুলেখাসান্যাল	শেষ সন্ধ্যা	পৌষ, ১৩৬৯
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	একটি সোনালী শামুক	মাঘ, ১৩৬৯
ঐ	জাতীয় মহাসড়কে	ভাদ্র, ১৩৭২
ঐ	বাবলতলীর মাঠ পেরিয়ে	বৈশাখ, ১৩৭০
ঐ	মৎস্য ভেদ	চৈত্র, ১৩৭১
ঐ	মৌ গাঁয়ের পথে ভোর	ভাদ্র, ১৩৭৫
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	পোস্টার	চৈত্র, ১৩৭০
হিমাদ্রিশেখর বসু	বিবাহে কান্না পর্ব	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

মন ও মস্তিষ্ক

সুজয় ঠাকুর

মনের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা গড়ে ওঠেনি। লেখাও এ বিষয়ে অনেক এবং জ্ঞানের বহু অঙ্গ এর সঙ্গে জড়িত। এবং যাঁরা এ বিষয়ে চিন্তা করেন তাঁরা প্রায় কোন ধারণাকে বা কোন শব্দকে ঠিক অবিকল এক অর্থে ব্যবহার করেন না। ফলে অনেক প্রয়োজনহীন তর্ক সৃষ্টি হয় এবং চিন্তা গুলিয়ে যায়। তবে মোটামুটি কার্যকরী ধারণা বিষয়টি নিয়ে করা যেতে পারে বলে মনে হয়।

যে কোন বিষয়ের কার্যকরী ধারণা হল তা যা বেশির ভাগ মানুষের জীবনকে অধিকতর সমস্যাবিহীন করে। এতে সন্দেহ নেই যে মানুষের প্রত্যেক প্রজন্ম সভ্যতার মোট জ্ঞান ভাণ্ডারকে বাড়িয়ে চলেছে তবে মনে হয় না সভ্যতার কোন অবস্থাতেই কোন 'চরম সত্য' সামনে এসে পড়বে।

জ্ঞানের সার্থকতা এটাই যে তা মানুষের (এবং সম্ভব হলে অন্যান্য প্রাণীদের) জীবনকে বেশি আনন্দময় করে, এ নয় যে কেবল কিছু ব্যক্তিকে ধনী হওয়ার বা নাম কেনার বা তথাকথিত জানার, স্বার্থপর আনন্দ প্রদান করে।

পরিভাষা ও ব্যাখ্যা

মন বস্তুটির পরিভাষা দেওয়ার চেষ্টা এই বলে করা সম্ভব যে এ এমন এক বস্তু যার দ্বারা ব্যক্তি বহিরাবস্থার পরিবর্তনে সাড়া দেয়, বস্তুত পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।

এমন বহু লোক আছেন যাঁরা মানেন না যে মনের সমস্ত গুণাগুণগুলি মস্তিষ্কের নানান পদার্থ বিদ্যা-ঘটিত এবং রাসায়নিক প্রণালীর ফল। এঁদের মতে কোনো পূর্ণ ব্যক্তি-চেতনা শরীরের অভ্যন্তরে আছে এটা সন্দেহজনক। তবে মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানে কর্মরত বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমে এই বিশ্বাসে উপনীত হচ্ছেন যে শেষ অবধি মনের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই রহস্যময় শব্দাবলী ব্যবহার না করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

বেশ কতকগুলি তথ্য সমর্থন করে যে মনের প্রক্রিয়াগুলি শরীরের কোন না কোন অংশ সমষ্টির সঙ্গেই জড়িত।

(১) বিশেষ বিশেষ মানসিক ক্ষমতার হ্রাস, শরীরের / মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট অংশে অস্বাভাবিকতা-প্রসূত (যা মাথায় আঘাত লেগে বা অন্য রোগজনিত মস্তিকাংশে সুস্পষ্ট-চিহ্নিত বিকৃতির বিদ্যমানতার জন্যে হয়েছে)।

(২) যে সমস্ত নতুন উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া মস্তিষ্কের গঠন, কার্যাবলী, রসায়ন, অধ্যয়ন করার জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলো সরাসরি দেখায় যে মানসিক-প্রক্রিয়া চলার সময় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে পরিবর্তন হচ্ছে।

(৩) দরকারী শল্য-চিকিৎসা চলার সময় উন্মোচিত মস্তিষ্কাংশের কোন কোন স্থানে মৃদু বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দিলে কিছু বিগতকালীন স্মৃতি রোগীর মনে সুস্পষ্টভাবে জেগে ওঠে। সেই সময়ের ভাবাবেগ এবং মানসিক অবস্থাকেও রুগী পুনর্বার উপলব্ধি করে।

(৪) যে সমস্ত ভেষজ মাদকতা, ঘুমভাব বা অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে সেগুলো শরীরের কোন একটি বা একাধিক অংশকে প্রভাবিত করে।

ভেষজের প্রভাব ছাড়াও কিছু মানসিক অনুভূতি হয় যা কোন তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রভাবের ফল নয় কিন্তু এমন প্রভাব যা মস্তিষ্কের কোন অংশে কোনোভাবে সঞ্চিত থাকে এবং পরে প্রকাশ পায়।

কিছু বিবরণ

প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র এবং মস্তিষ্ক অধ্যয়ন করে দেখা গেছে যে অন্য অঙ্গগুলোর মতন মস্তিষ্কও সরল থেকে জটিলতরূপে বিবর্তিত হয়েছে। মস্তিষ্ক কোষগুলির এক অন্যের মধ্যে সংযুক্তি-বর্তনীর জটিলতাই মানুষ এবং অন্য প্রাণীদের মধ্যে মানসিক পার্থক্যের প্রধান কারণ।

মস্তিষ্ক কোষগুলি অন্যান্য কোষগুলি থেকে একটু অন্য রকম। সবগুলি নিজেরাও একেবারে এক রকম নয়। বহু ক্ষেত্রে কোষগুলি সংহত বর্তনী (closed circuite) তে যুক্ত এবং বহু জায়গায় প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া (feed baek mechanism) কার্যকরী। সংযুক্তি পথগুলি ভিতরের দিকে তথ্য বা বাইরের দিকে আদেশ বহন করছে। কিছু অন্তর্বর্তী কোষ কেবল অন্য মস্তিষ্ক-কোষের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু কোন শারীরিক কোষের সঙ্গে যুক্ত নয়। এগুলি পূর্ব-অভিজ্ঞতার তথ্য সরবরাহ করে। নিকোটিন, মারিজুয়ানা, সুরা, এল এস ডি, এগুলি মস্তিষ্ক কোষগুলির সংযুক্তি-স্থলগুলির গুণাগুণের পরিবর্তন সৃষ্টি করে কিংবা

সংযুক্তি স্থলগুলির মধ্যে থাকা প্রেরক পদার্থ (neuro transmitter) গুলির গুণাগুণে পরিবর্তন আনে।

অর্থাৎ সবই নেহাত পদার্থ বা রসায়ন বা সেরকম প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথা।

সাধারণ মানসিক ক্রিয়া যেমন স্পর্শ, দৃষ্টি, শ্রবণ, বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, মস্তিষ্কের স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট এলাকাতে চিহ্নিত করা যায়। তবে জটিল মানসিক প্রক্রিয়াগুলির স্থানীয়করণ সম্ভব হয়নি। এও দেখা যায় যে উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বয়স ও শিক্ষার প্রভাবে স্থান পরিবর্তন করে।

নম্যতা

মস্তিষ্কের সব চেয়ে চমৎকারী ক্ষমতা হল নম্যতা (plasticity)। এর মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল কোষ-সংযুক্তি পথগুলিতে এবং সংযুক্তি স্থানগুলির শারীরবৃত্তীয় গঠনে পরিবর্তন।

যতটা জটিলতা কোষগুলির সংযুক্তিতে ছিল, এবং মস্তিষ্ক কোষের সরু উপাঙ্গ (dendrites) গুলি যতটা দীর্ঘ এবং শাখা-বিশিষ্ট ছিল, তা এই নম্যতা গুণের জন্যে বাড়ে। এটা সবই কিন্তু সক্রিয়তার ফলে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি ধ্বংসাত্মক স্থায়ী পরিবর্তন মস্তিষ্কে হয় বটে। কিন্তু নম্যতাগুণের কারণে, শরীরের অন্যান্য অংশের মত বয়সজনিত ক্ষমতা হ্রাস কার্যকরী হতে পারে না। বহু কোষ যা জীবনারম্ভে দরকারবিহীন, "প্রয়োজনাতিরিক্ত" (redundant) মনে হত সেগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষগুলির কাজ হাতে তুলে নেয়। "কাজে লাগাও, নয় খুইয়ে দাও" কথাটি অন্তত মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সত্যি।

এ ছাড়া আরেকটি ব্যাপারও আছে। মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলের উপরে অবস্থিত আছে মস্তিষ্কের দুটি প্রায় এক রকম অর্ধেক যাকে সাধারণত দুটি গোলার্ধ বলা হয়। কোন একটিতে আঘাত বা অসুস্থতাজনিত বিকল হওয়া কোন বিশেষ ক্ষমতা, অন্য গোলার্ধটির অনুরূপ অংশ, ক্রমে কার্যান্বিত করতে আরম্ভ করে।

ছড়ানো মানসিক ক্ষমতা

মস্তিষ্কের পুরোভাগ ও রগের কাছের পিণ্ডগুলো কতগুলো ছড়ানো মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন কথা বলা, শিখতে পারা, স্মৃতি, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম কুশলতা, ইত্যাদি এবং এমন কতগুলির সঙ্গে যে গুলোর পরিভাষা দেওয়া শক্ত কিন্তু যে গুলোর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এগুলি কাব্যিক আবেগ বা এমন এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির আবেগ যা আমরা কমই উপলব্ধি করি বা একেবারেই উপলব্ধি

করি না কারণ এ যাবৎ বিবর্তনে এ গুলির ব্যক্তি-জীবন-দীর্ঘতর করার-মূল্য (survival value) গুরুত্বপূর্ণ হয়নি।

কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি, যাঁদের সাক্ষ্যকে কিছুতেই প্রতারণা বলা চলে না, এই শেষোক্ত ধরনের আবেগ উপলব্ধি করেছেন। হতে পারে বিবর্তনের ভবিষ্যৎ পর্যায়ে এ ধরনের উপলব্ধিগুলো জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের মানুষের, এবং তাদের পক্ষে একাধিবার, হবে। এটা কিন্তু মনে রাখতেই হবে, যাঁরা এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা এও বলেছেন যে কেবল এ ধরনের ভাবাবেগ নিয়ে মেতে থাকা গর্হিত স্বার্থপরতা হবে। তাঁরা এও উল্লেখ করেছেন যে এ রকম ভাবাবেগ প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যাপক মমতারও জন্ম দেয় যা ব্যক্তিকে এ চেষ্টা করতে বাধ্য করে যে সভ্যতার সমস্ত লাভ সব মানুষের (এবং সম্ভব হলে সব প্রাণীর) কাজে লাগুক। এই মহামানবরা বৈজ্ঞানিকদেরও বলেছেন যে তাঁরা যেন কেবল জগৎকে জানার ব্যক্তিগত আনন্দে না লীন থাকেন।

পূর্ণ বয়স্ক প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবেই এমন জৈব রাসায়নিক নিরাপত্তা আছে যা মস্তিষ্ককে কখনো প্রয়োজনে ব্যবহার যোগ্য খাদ্য-সঞ্চয় হিসেবে প্রযুক্ত হতে দেয় না (অনাহারজনিত মৃত্যু মুখের চরম অবস্থা ছাড়া)। নিতান্ত শিশুর মস্তিষ্ক গঠনকালে কিন্তু তা নয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টিগত অবস্থা, জন্ম থেকে ৬।৭ বছর বয়স অবধি পুষ্টি, মস্তিষ্কের সম্যক্ বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি ব্যক্তির মস্তিষ্ক-বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম-সকলের উপরও কাজ করে ফলে পুরো সমাজকে প্রভাবান্বিত করে। তাই সহজেই অনুমেয় মানুষের পুষ্টিগত অবস্থার মান কোন কারণে কমলে তার ফল সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থার উপরও পড়ে।

স্মৃতি

মানুষের মনে রাখার ক্ষমতা মনে হয় সুরু মস্তিষ্কে (মস্তিষ্কের পুরোভাগের আস্তরণ অংশে carebral cortex এ) অবস্থিত তবে তার কোন বিশেষ জায়গায় নয়। অন্য যে সমস্ত প্রজাতি এই আস্তরণ-বিহীন তাদেরও মনে রাখার ক্ষমতা কোন ভাবে আছে। Steven Rose এর মতে স্মৃতির কোন ব্যাপার এমন নয় যা 'প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্তনী / পরিমার্জিত সংযুক্তি-স্থল' (redundant circuit / modifiable synapse) সিদ্ধান্ত দ্বারা বোঝা না যায়। এই সিদ্ধান্তটিতে বলা হয় যে সংযুক্তি বর্তনীগুলি (Connection circuits) এবং সংযুক্তি স্থানের স্নায়বিক প্রেরক পদার্থগুলি (neuro transmitters) দুই

স্মৃতি নিবেশিত হওয়াব সময় পবিবর্তিত হয়। একই স্মৃতি সুবু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে এবং উভয় গোলার্ধের কয়েক জায়গাতে নিবেশিত হয়।

কৃত্রিম মানব

এখনও মানুষেব মস্তিষ্ক সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা নেই কিন্তু কৃত্রিম মানব সৃষ্টিব জল্পনা-কল্পনা জ্ঞান-বিজ্ঞানেব বর্তমান অবস্থাতেই কবা যায ও করা হয। মনে বাখা দবকাব যে মস্তিষ্কেব এবং প্রাণীদেহেব জটিল ক্ষমতা সকল, উপাদানগুলিব তাৎক্ষণিক বৃদ্ধি, গঠন বা সৃষ্টি, ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত; যাতে সেগুলি দবকাব মত পবিবর্তিত হ'যে বাইবে থেকে আসা ও ভিতর থেকে উদ্ভূত দুবকম উদ্দীপকেই সাডা দেয।

জৈব প্রযুক্তি বিদ্যাব সাহায্যে কৃত্রিম মানব তৈবি হযত সম্ভব যদি প্রচণ্ড খরচ করা যায় এবং শবীব বিজ্ঞান আর জৈব-বসায়ন বিষযে পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের জন্যে প্রচুর পরিশ্রম কবা যায়।

তবে ঢেব বেশি বাঞ্ছনীয হবে যে এই প্রচণ্ড খরচ এবং পরিশ্রম, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তিকে বিবাট সংখ্যক বর্তমান মানুষেব কাজে লাগার জন্যে করা হোক্। কৃত্রিম-মানব সৃষ্ট হলে সমাজ-বিজ্ঞানগুলির সমস্য-সকলও ভযাবহভাবে বৃদ্ধি পাবে।

যে লেখাগুলি পডে লেখা ঃ—

(1) The Human Brain John Pfeiffer 1966

(2) Conscious Brain Steven Rose 1976

(3) Mind of Brain . J H Ormstein 1972

(4) Conscisousness and the Natural World Ed. B. D. Josephson, V S. Ramchandran 1980

(5) Brain & Mind Ed. David Oaklay . 1985

(6) Dragons of Eden Carl Sagan 1988

(7) Scientfic American · Special Issue on the Brain: 1992 (Ian)

(8) Article "Consciousnen and Beyond" Shri P. N. Tandon Ind. Nat. Science Academy February 1993

(9) Current Science Special Issue on Neuro Sciences: Ianuary, 1995

কু-বসন্ত

বিকাশ গায়েন

পলাশ এখন বড় হচ্ছে বান্ধবী তার অনেক।
কেউ গান গায়, সেতার বাজায় আহির-ভৈরবে,
পলাশ তাদের কয়েকজনকে অন্যরকম চোখে
খবর পাঠায়। সংকেতময় ভাষার প্রাচীন পুঁথি
তাদের সামনে উদাস রাখে কোচিং-এ প্রাইভেটে।

দু' পাড় জোড়া অলীক সাঁকোয় হাঁটিতে হাঁটিতে একা
পলাশ ক্রমেই পৌঁছে যাচ্ছে গন্ধরেণুর দিকে।

পৌঁছে যাবার পথের বাঁকে রহস্যময় বাড়ি
হাতছানি দেয় ; এক পা যেতেই ভুলিয়ে তাকে ধরে।
পলাশ এবার হিংসা শেখে, রাত্রে বাড়ি ফেরা
আঁধার জপেন অরণ্য-মা, জারুল-প্রতিবেশী—
পলাশ কখন ব্রিজের নিচে আগুন হয়ে ফোটে।

কবির অন্তিমযাত্রা

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

(পুনর্বার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়-কে)
কবির অন্তিমযাত্রা আমি দেখি নাই
দেখি নাই কোনো কবিদের বিষণ্ন মিছিল, সেইদিন।
সেদিন প্রভাতে আমি চৈতন্যবিহীন, তীব্র কোনো
গাঢ়তর স্বপ্ন দেখেছিলাম।
ভুল হোক ঠিক হোক বুক কাঁপা
স্বপ্ন দেখেছিলাম ফুলেদের নিয়ে।

আমার ছোট্ট মেয়ে লীনা
তৃণে লীন হয়েও উধাও হল না।
কুড়িমাস বয়সে যতখানি বপ্ত হওয়া যায়
দৌড়ে ও ঝাঁপে, তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি
উড়ে গেল ফুলেদের দেশে,
এক ফুল থেকে অন্য ফুল
অন্য ফুল ছিঁড়ে ভিন্ন কোনো গাছে
চৈতন্যবিহীন আমি গাঢতব স্বপ্ন দেখেছিলাম।
প্রজাপতি ফ্রক পবে ফুলেদেব চৌহদ্দির মাঝে
দাপাদাপি কবে নিয়ে এল একগুচ্ছ ফুল।
ছোট্ট হাতের ফাঁকে গুচ্ছ সরে গিয়ে ক্রমশ
লীন হতে হতে পাপড়ি ভেঙে ধরা দিল
এক, দুই, খণ্ডাংশ তৃতীয় অথবা।

আমার উঠানে আজ বাশি রাশি
ফুলের মিছিল
আমার উঠানে আজ রাশি রাশি
কবিব মিছিল
আমাব উঠানে আজ রাশি রাশি
শবেব মিছিল

এক ফুল ডাকে অন্য ফুলেদের
এক কবি অন্য কবিকে,
এক শব শুধু নির্বাক তাকিয়ে
অন্য শবাধারে।
সমগ্র উঠান জুড়ে ফুলেব বিছানা
ডুকরে ক্রন্দনে ডোবে ছোট্ট তৃণলীনা
—না, ওভাবে যাবে না।

একে একে উঠোন শূন্য হল
ফুলগুলো তুলে নিল কবিদের দল
কবিরাই তুলে নিল শব
শবগুলো নিয়ে গেল ফুলেদের দেশে।

কাকে নিয়ে গেল ফুল
সে কি তোমার চেনা ?
প্রশ্ন করে ছোট্ট তৃণলীনা।

আমি বললাম, কবিকে গিয়েছে নিয়ে ফুলেদের দেশে।
সময় হয়েছে।
ফুলেদের কোনো ভয় নেই
ফুলগুলো আমার চেনা।
আমার মেয়ে ডুকরে কাঁদে—'না'
ওভাবে যাবে না একাকী
আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

—তৃণলীনা তুমি ওভাবে যাবে না
ওভাবে যেতে নেই ফুলেদের দেশে, একা।
আমিও যাব না। তোমাকেই সঙ্গে নিয়ে যাব।

কবির অন্তিম যাত্রায় আমি হাঁটি নাই
দেখি নাই আমি ফুলের মিছিল
সেদিন প্রভাত শুধু চৈতন্যবিহীন
গাঢ়তর তীব্র কোনো স্বপ্ন দেখেছিলাম।

সম্বোধন

অচিন্ত্য বিশ্বাস

আমাদের প্রথম ভুল
গুহার মধ্যে আমরা ব্যাঙের ছাতা দিয়ে ফুলদানি সাজিয়েছিলাম

আমাদের দ্বিতীয় ভুল
ঘাসের বীজ থেকে রুটি আর
কাঁটা বেগুন পুড়িয়ে খেতে খেতে ভেবেছি রাজভোগ খাচ্ছি

আমাদের সর্বশেষ ভুল
সবাই সবাইকার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম জবুথবু হয়ে

পাশাপাশি শীতকালের সকালে
ফুটফুটে শিশুরাও ললিপপের মোড়কের মতো
সোয়েটার, মোজা আর টুপি পরে চলে গেছে
আগামী বসন্তে ওরা মসমস করে নামবে নতুন মোটর গাড়ি থেকে

মেয়েরা হেসেছে জল ঝরণা মতো
আর আমরা সব চাবুকের শব্দে জেগে উঠে
পথের দুপাশে পাথর দিয়ে পাথর ভেঙেছিলাম

ভাঙো ভাঙো ভাঙো
দরকার হলে তারও আগে ভাঙো ভয়
ওরে আহাম্মকের নীতি—
আকাশে উল্লাস করছে স্বাধীনতার সূর্য
বেরিয়ে আয়

শেষ রাত্রির ট্রেনে

অমিত রায়

ডাক পাঠালো ওরা যখন আকাশ ছিল কালো
বেণীর চুড়োয় ফুল ছিল সব শেষ রাত্রির ট্রেনে
পায়ে নূপুর শব্দ তারা এমনি আগোছালো
কেউ বা ক্যানিং ছাড়বে লোকাল হয়তো বা জংশনে
নামবে কজন গরঠিকানী দল বদলের আগে
ত্রস্ত পায়ে জমিদারবাবুর মিটিয়ে নেবে দেনা
দিকহারা সব ঘোমটা খোলা মন দেহ সাতভাগে
নীল শহরের আবছা আলোয় রাতের পরোয়ানা
ওড়ায় ওরা নির্বেদে যায় বিস্ময়ে, নির্বাচন
কালরাতে ঠিক মিলবে কজন স্টেশনে জংশনে।

চায়ের ভাঁড়ে মুখ দেখে নেয় আধকোমরের ঠেলা
এ ওকে দেয় রাত ফুরোলো চুলে বেলের কুঁড়ি
ও মালতী ছেলের অসুখ·· জড়িয়ে ধরে গলা
কাল যাব না আজকে রাতেই ভাঙব কাঁচের চুড়ি
এমনি আরো অনেক কথা দীঘল রাতে মেশে
এমনি আরো দীর্ঘশ্বাসে জড়িয়ে থাকে, পাখি
সাক্ষি থাকে রাত পাহারা হারায় নিরুদ্দেশে
কারসেডে কে জ্যোৎস্না ও চাঁদ একলা শোনো নাকি
একটি তারা আকাশ গাঙে একটি থাকে মনে ··
আবার ওরা মিলবে কজন স্টেশনে জংশনে।

আঁচ ও কলকাতা ময়দান ঃ

সমর্পন মুখোপাধ্যায়

মৌসুমী বাতাস ছিল না ; ছিল না গঙ্গার হাওয়া ;
ছিল কাছে পুষ্করণী, আকাশে চাঁদোয়া ; পুবের বাতাস
ছিল আগুনে ভেজা।

ঝড়ের সংকেতে ছিল মৃতের গন্ধ, দাবানল শিখা, লোল
জিহ্বা আগুনের পুড়ে যাওয়া দিশা।

কতেক মানুষের ছিল উৎকণ্ঠা। মাঠে দূরে বসা, কেউ বা
দাঁড়ানো ; ইতস্তত ছোটাছুটি, কিছু ভস্ম-মৃতের আত্মা ঃ
মুঠোভরা বই সকল—আধপোড়া।

যে বুকে তৃষা ছিল গনগনে,
বইয়ের টাটকা আঁচে—
উসকে দেওয়া সলতের আগুনে
খাক্ হয়ে মিশে যায়-সে, আজ,
কলকাতা ময়দানে ॥

ভালবাসার অলীক স্রোতে

সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য

ঘরের ভেতব অবাধ্য মন
বালুব চরে সমুদ্র.
আকাশ জুড়ে বৃক্ষ রোপণ
তীব্র বিষে নীলাদ্র।

অরণ্যময় জ্যোৎস্না উথাল
ইন্দ্র-আলয় প্রদক্ষিণ,
মন মহুয়াব গন্ধে মাতাল
পাহাডতলির সিক্ত দিন।

হাতের মুঠোর জীবনটাকে
বৃত্তে সচল আবর্তন.
ছটফটে মন পথেব বাঁকে
পাখিব ডানায় ভূ-কম্পন।

ভালবাসার অলীক স্রোতে
প্রহেলিকার স্বপ্নঘন,
বনবাসীর বিষাদ রথে
শাবক শ্লোকের অধ্যয়ন।

মেদুন-আলোয় আকাশ ভেঙে
কৃষ্ণ বাদল জীবন্ত,
সারাটা গায় আগুন মেখে
উপোসী রাত দুরন্ত।

মুখাগ্নি করো না

একদিন বলেছিলে

কৈকেয়ীর মত যখন খুশি বর চেয়ে নিতে
একদিন, একমাস, একযুগ ধরে
কেবল চেয়েছি একটি বৃষ্টির দৃশ্য।
সবুজ আঁচল দুলিয়ে
বাতাসের সঙ্গিনী
পৃথিবীর সবুজে
যখন গলে গলে পড়ে
সোহাগী নারীর মত,
তারই একটা ফ্রেম—
দিতে পারনি।
শুনতে চাইনি রবীন্দ্র সঙ্গীত
সন্ধ্যায় চাইনি পেতে
এই ধোঁয়াশা শহরে
শৈরিব মগ্নতা। জানি,
এখানে এখন শুধুই
ভালবাসাহীন মানবজমিন।
তাই একটাই কামনা—
মৃত্যুর পর মুখাগ্নি করো না।

নতুন বছরে

লালিয়া দাস

একদিন ঠিক জেনো, আমারি মুখের মতো
নতুন বছরে উঠে যাবে অস্পৃশ্য কালো চামড়া,
সুন্দরের মিছিলে হেঁটে যাবে রুগ্ন বেতসী মেয়ে,
ঠিক বারোটায় উথলে উঠবে
শীর্ণ আঙুল সেতার–
টিপটিপ বৃষ্টিতে অতনু খুঁজে চলবে কমলাকে,
রঙিন পতাকা হাতে উড়ে যাবে পাউরুটি-বালক,
জেনো ঠিক একদিন—নতুন বছরে—
আমাদের আছে কিংবা নেই থেকে বারবার
খসে পড়বে নতুন উচ্ছ্বাস।

সত্যদা কে "লাল সেলাম" ও জ্যোতিবাবুর "অনুমোদিত জীবনী" : দুই কমরেড-এর কাহিনী

জয়ন্ত ঘোষ

"যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মন মনে হয়"
[জীবনানন্দ উদ্ধৃত করেছেন অশোক মিত্র]

প্রথম বইটি সত্যব্রত সেন-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মূলত দেশহিতৈষীর কর্মি-বৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ। দ্বিতীয়টি জ্যোতি বসুর The Authorised Biography।

বই দুটির নায়কদের পারস্পরিক জীবনে নানান্ ব্যতিক্রম ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও কয়েকটি আশ্চর্য এমনকি মজাদার মিল নিশ্চয় অনেক-এর দৃষ্টি এড়াবে না। দুজনেরই জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছর ১৯১৪ সালে। দুজনেই বিত্ত-সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী বংশের ছেলে। দুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে, কয়েক মাসের তফাতে দুজনেই বিলেত যাত্রা করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার অল্প কিছু আগে-পিছে দুজনেই দেশে ফিরে আসেন। কাকতালীয়ভাবে দুজনের ছেলেরই ডাকনাম চন্দন। দুটি বইএরই প্রকাশ লগ্ন হচ্ছে সাতান্নবই সালের বইমেলা।

বিশ্বশ্রুত ফরাসি দার্শনিক জ্যাক ডেরিডার নাম এর সঙ্গে "Deconstruction" বা বাংলায় 'অবিনির্মাণ' তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ডেরিডা সাহেব প্রধান অতিথি রূপে উদ্বোধন করলেন এ বছরের বইমেলা। ঠিক তার পরে পরেই নিজের অনুমোদিত জীবনী গ্রন্থের প্রকাশানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলেন স্বনামধন্য জ্যোতিবাবু।

একদিন বাদে, সেই একই মঞ্চ থেকে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর স্মরণে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন জ্যাক ডেরিডা। বিষয় ছিল "A Short History of Lie · The State of Lie and the Lie of the State"। বললেন, রাজনীতিতে মিথ্যাভাষণ বা মিথ্যাচারণ নতুন কিছু নয়। তবে আধুনিক

'প্রচার-প্রকৌশল'', ডেরিডার ভাষায় "Technomedia"র মারাত্মক শক্তি ও প্রভাব অতীতকালে কল্পনাতীত ছিল। খবর আস্তে আস্তে ছড়ালে তার যাচাই বাছাই-এর একটা অবকাশ থাকে। কিন্তু দশ দিক থেকে সহস্র প্রকরণে একই বার্তা বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লে লোকে বিভ্রান্ত হয়। আজকের দিনে অসত্য ও সাজানো অর্ধ-সত্যকে নিয়ে সারা বিশ্বে শুধু ঢাক পেটানো যায় না, Technomedia'র গুণে প্রকৃত সত্যকে সমূলে বিনাশ করাও সম্ভব। ডেরিডার পন্থা অনুসরণ করে উপরোক্ত তথ্য সাযুজ্যের ফিরিস্তি অবিনির্মাণ করতে বসলে কি অর্থ বা অনর্থ হতে পারে কেউ ভেবে দেখেছেন কি ?

স্বাধীন ভারতের প্রবীণ পলিটিশিয়ানদের জীবন আলোচনা করতে গেলে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন-এর সময় অথবা তথাকথিত অগ্নি যুগে তাঁরা কি করছিলেন সেই প্রসঙ্গ অপরিহার্য। অনেক আপাত তুচ্ছ ঘটনা বা তথ্যের মধ্যে জীবনীকারদের গুরুগম্ভীর তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে হয়।

সত্যব্রত সেন-এর ছেলেবেলা কেটেছে বরিশাল শহরে। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে সুধাংশু দাশগুপ্ত ও প্রমোদ দাশগুপ্ত'র নাম করা যেতে পারে। ইস্কুল জীবন থেকেই তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামী হিসেবে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুধাংশু দাশগুপ্ত ও আরও অনেকের সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মেছুয়াবাজার বোমার মামলার সম্বন্ধে কিছু বাড়তি তথ্য জানা যায় ''অনুমোদিত জীবনী'' থেকে। জ্যোতিবাবুর জ্যাঠামশায় সেই মামলায় Special Tribunal Judge নিযুক্ত ছিলেন !

স্কুল জীবনে জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক সচেতনতার বিষয়ে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে ''অনুমোদিত জীবনী'' অনুসরণ করে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-এর সময় তিনি ছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স-এর ছাত্র। কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে ঘটনার নিন্দা করছিল। জ্যোতি বোস তাদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করেন। ফলে চোখে কালশিরা পড়ে, এবং তাই নিয়ে সদর্পে সাইকেল চড়ে বাড়ি ফেরেন। মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হলে, জ্যোতি বোস, প্রতিবাদে একদিনের জন্য ইস্কুল কামাই করেছিলেন। পিতা নিশিকান্তবাবু, ব্যক্তিগত আপত্তি সত্ত্বেও ছেলের ছুটির দরখাস্ত লিখে দেন।

আমাদের দুই নায়কই তখনকার দিনের বড় ঘর-এর ছেলেদের মত উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন। তবে সত্যব্রত সেন-এর ক্ষেত্রে বিলেত যাত্রাটা জেল

থেকে খালাস পাওযাব একটা বাড়তি কড়াব হিসেবে খানিকটা বাধ্যতামূলক হযে উঠেছিল।

ভেবে দেখলে সত্যব্রত সেন-এব পক্ষে জেলে ঢোকা, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়াব চাইতে কম ফলপ্রসূ হয়নি। জেলে বসেই তিনি পবীক্ষার পড়া কবেছিলেন ও "কৃতিত্বেব সঙ্গে পবীক্ষা পাশও কবেছিলেন। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁব বাজনৈতিক চেতনাব পরিবর্তন ও বিকাশ।

সে যুগে 'বিলেত ফেবত কমিউনিস্ট' বলতে একটা আলাদা শ্রেণী ছিল। তিরিশ দশকেব অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ইত্যাদির ছাত্র মহলে বাম বাজনীতির একটা ঢেউ উঠেছিল। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এবঅধ্যাপক হ্যাবল্ড ল্যাস্কি,কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন-এব হ্যাবি পলিট, বজনী প্যালমে দত্ত ইত্যাদিব বাণী ও ব্যক্তিত্বে প্রবাসী ভাবতীয় ছাত্রদেব মধ্যে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেদিনেব এই জোয়াবেব ধাক্কায জ্যোতি বসু সমেত বহু যুবক দেশে ফিরেছিলেন কমিউনিস্ট ভাবধাবায দীক্ষিত হযে। যাদেব মধ্যে নাম কবা যেতে পারে অধ্যাপক / সাংসদ সুশোভন সরকাব, হীবেন মুখার্জি, ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য ও বর্তমান কেন্দ্রীয় স্ববাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিত গুপ্ত ও আবও অনেক এব। সত্যব্রত সেন কিন্তু অন্য আর এক ধারা থেকে উঠে এসেছিলেন। তাঁব মত অসংখ্য উগ্রপন্থী যুবককে বৃটিশ সবকার অন্তবীণ বা দ্বীপান্তবিত কবেছিল। বন্দী অবস্থায তাদের মধ্যে বহু যুবক সমবেত হযে গভীবভাবে মার্কসীয় তত্ত্ব অধ্যযন ও চর্চায মনোনিবেশ কবেছিলেন। মজাব বিষয় হল, জেল কর্তৃপক্ষ মার্কসবাদী বইপত্রের ওপর তেমন কড়া নজব বাখতেন না। জেল থেকে বেবিযে, এঁদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যৎ জীবনে, দেশেব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভিত্তিমূলক অবদান বেখেছেন। সত্যব্রত সেন-এব 'টেবোবিজম' থেকে 'মার্কসইজম-এ উত্তবণ ঘটেছিল বিলেত যাবাব আগে অন্তরীণ অবস্থাব মধ্য থেকেই।

কেবিযাব হিসেবে কমিউনিজম বেছে নেবাব বিষযে জ্যোতি বোস মনস্থিব কবে ফেলেছিলেন বিলেতে থাকতে থাকতেই, ছাত্রাবস্থায়। সুতরাং ব্যাবিস্টারীব ফাইনাল পবীক্ষায বসাব কোনও মানে হয় কি না সে বিষযে দোনামোনা করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। জীবনেব সেই সন্ধিক্ষণে C P. G B'ব সদস্য এবং বিখ্যাত মিরাট ষড়যন্ত্র মামলাব অন্যতম অভিযুক্ত বেন্ ব্র্যাড্‌লি তাঁকে উপদেশ দেন "Social Acceptance was an Imperative for a Career in Politics"। জ্যোতি বোস সাবেক কায়দায ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন।

সত্যব্রত সেন বার্মিংহাম থেকে সংখ্যা-তত্ত্বে স্নাতক হন। গতানুগতিক ধারার এটা খানিকটা ব্যতিক্রম।

হীরেন মুখার্জি, সাজ্জাদ জাহির ইত্যাদিরাও পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এলে প্রবাসী ছাত্র সংগঠনগুলিতে একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে জ্যোতি বোস 'লণ্ডন মজলিশ' এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতে সমর্থ হন। সুযোগ হয়ে যায় জহরলাল, সুভাষ বোস, ভুলাভাই দেশাই, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইত্যাদি মান্যগণ্য নেতারা বিলেত এলে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার। ক্যারিসম্যাটিক নেতাদের মত জ্যোতি বোসের ক্ষেত্রে লাইম-লাইট আকর্ষণ করার একটা সহজাত ক্ষমতার এইটি প্রথম প্রকাশ। ভবিষ্যৎ জীবনে যার বিস্তৃত তালিকার মধ্যে আছে '৪৬ সালে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হওয়া এবং '৫২ সালে লিডার অব দি অপোজিশন হয়ে যথাক্রমে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী ও বিধান রায়ের সঙ্গে বহুল প্রচারিত তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

জ্যোতি বোস-এর প্রবাসী ছাত্র জীবনের কিছু সরস স্মৃতিচারণ আছে অনুমোদিত জীবনীতে। যেমন বন্ধুদের সমভিব্যাহারে মত্ত অবস্থায় মটর দুর্ঘটনা ইংলণ্ডে কিছু ভ্রমণ, প্যারিসে ফোলি বার্জেয়ার ও পিগাল-এর নাইট-লাইফ দেখতে যাওয়া ইত্যাদি 'অ্যাডভেঞ্চার' যার দুএকটা সব ছাত্রেরই কপালে জোটে। মটর দুর্ঘটনার বিবরণ থেকে জ্যোতি বসুর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কতকগুলি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেমন, বিপদে স্থৈর্য, সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও পরিমিতি বোধ। মটর দুর্ঘটনাটি জ্যোতিবাবুর কিংবদন্তি সুলভ Luck এরও একটি নিদর্শন। ঘটনায় সকলেই আহত হয়েছিল তিনি ছাড়া। পাটনা রেল স্টেশনে জ্যোতি বোসকে লক্ষ্য করে মুখোমুখি গুলি ছোঁড়ে এক আততায়ী। অতর্কিতে সামনে এসে পড়ে প্রাণ হারান আলি ইসম। সাধারণত নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি সাবধানী জ্যোতি বোস কিন্তু সংকটকালে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন বার বার। '৪৬ সালে এক দাঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা থেকে আব্দুল মান্নানকে উদ্ধার করা যার অন্যতম।

অপর পক্ষে সত্যব্রত সেন-এর শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে তাঁর বিলেত-এর ছাত্র জীবন সম্বন্ধে প্রায় কোন তথ্যই কেউ দিতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথ-এর দৌহিত্র ও সুসাহিত্যিক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রবাসকালে ছিলেন সত্যব্রত সেন-এর সহপাঠী এবং দেশে ফিরে আই এস আই এর সহকর্মী। তাঁর স্মৃতিচারণ 'চারনিকা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় সত্যব্রত সেন অতি অল্প খরচায় সাইকেলে ও

পদব্রজে ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন এবং চেকোস্লোভাকিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

১৯৪০ সালে দেশে ফিরে জ্যোতি বোস কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। প্রথমে ডক ও রেল কর্মীদের মধ্যে একেবারে তৃণমূলে সংগঠন-এর কাজে সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় থেকে '৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার সাংসদ নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালটিতে জ্যোতি বোস এর ভাবমূর্তি সব চাইতে উজ্জ্বল ও স্মরণীয়। তবে ঝোলা কাঁধে লোকাল ট্রেনে মফস্বল পার্টি কর্মী জ্যোতি বসুর যে চিত্র পাই তা অল্প দিনের। কারণ '৪৫ সালে তিনি যে রেল মজদুর ইউনিয়ন -এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তা কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পায়। অনুমোদিত জীবনীর ভাষায় "In The Days of Penury (IT) Allowed Him Free Travel by First Class on all Bengal Railways !" জ্যোতি বসু কোনও দিন গাড়ির মালিক হননি, কিন্তু সরকারি সুবিধে পাওয়ার আগে যে শোফার ড্রিভেন ফিয়াট গাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন তা এক শুভানুধ্যায়ীর দাক্ষিণ্যে সম্ভব হয়েছিল [পৃ ১৭৭]।

আজ পর্যন্ত জ্যোতিবাবু কোনও দিন নির্বাচন-এর দৌড়-এ হারেননি। বাহাত্তর সালে বরাহনগর থেকে নাম প্রত্যাখ্যান করে নেওয়া তাঁর রাজনৈতিক-বিচক্ষণতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ওই নির্বাচনে জয়ী হতে পারলে সাংসদ-হিসেবে আজ তাঁর হাফ সেঞ্চুরি আপ হয়ে যেত। মুখ্যমন্ত্রীত্বের ম্যারাথন-এর সঙ্গে তিনি আর একটি রেকর্ড স্থাপন করতে সমর্থ হতেন। অনেকের কাছে-সৌরভ গাঙ্গুলীর 'লর্ডস'-এ সেঞ্চুরীর মত, যে রেকর্ড বাঙালি জাতির একটা গৌরব। আজ পার্টিতে জ্যোতিবাবুর প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ নির্বাচনের ময়দানে, ভিড় টানার অনন্য সাধারণ ক্ষমতা। যে সমস্ত দৈনিক ও সাময়িক পত্র-এককালে জ্যোতি বোসকে এক কলম গাল না পেড়ে ছাপাখানা থেকে বের হত না আজ তারা প্রায় India is Indira and Indira is India'র সুরে বলেন সি পি এম এ জ্যোতিবাবুই একমাত্র। কাগজগুলি বদলায়নি তবে বদলেছে কী? অনুমোদিত জীবনীতে প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভে বিফল মনোরথ হওয়ার বিষয়ের অধ্যায়টির শিরোনাম 'The Unkindest Cut !' এই অধ্যায়টি পড়লে মনে হয় তিনি এখন ভারতবর্ষের সব চাইতে জনপ্রিয় কম্যুনিস্ট।

সেখানে বলা হয়েছে—"The 'Washington Post' had head lines calling Jyoti Basu the future Prime Minister of India and so

did The 'New York Times'" [পৃ ২১৬]। দেখা যাচ্ছে অপ্রত্যাশিত মহলে জ্যোতিবাবুর জনপ্রিয়তা শুধু দেশে নয় বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

এক ব্যবসায়িক সংস্থার ছত্রচ্ছায়ে তাড়া-ঘড়ি এ ধরনের অনুমোদিত জীবনী ছাপানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। 'Asian Age' কাগজের সম্পাদক আকবর সাহেবের কাছে তাঁকে প্রধান মন্ত্রী না হতে দেবার বিষয় পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর সেই বিখ্যাত উক্তি "It was a historical blunder" বর্তমান বইটির সেণ্টার পিস বলা যেতে পারে। পলিটব্যুরোর ভোটাভুটির ভেতরকার খবর দিয়ে Historical Blunder এর বক্তব্য বকলমে আরও জোরদার ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। এইভাবে পার্টি-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করলে অন্য কোনও সদস্যের কি পরিণতি হত অনুমান করা শক্ত নয়। অন্য ভাবে দেখলে বলা যেতে পারে আলি ইমাম-এর কাকতালিয় বলিদান একদিন যেমন পাটনা স্টেশনে জ্যোতি বোস এর প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল তেমনি বর্তমান পরিস্থিতিতে দেবেগৌড়া প্রধানমন্ত্রিত্বের হাঁড়িকাঠে মাথা বাড়ানোর জন্য জ্যোতি বসু রক্ষা পেয়েছেন। সেই সঙ্গে পার্টির ভাবমূর্তিও বলি হয়নি।

অনুমোদিত জীবনীতে জ্যোতি বোস এর যে সমস্ত গুণাবলী বিধৃত হয়েছে তা সাজিয়ে ধরলে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ রূপরেখা ফুটে ওঠে। "At best of times he was not been communicative or sociable" ইন্দিরা গান্ধীর জীবনীকাররা তাঁর বিষয়ে একই কথা বলেছেন। ব্যতিক্রম স্বরূপ যতীন চক্রবর্তীর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর সৌহার্দ্যের অন্তরঙ্গ বর্ণনা আছে। সকালে একবার চা খেয়ে জ্যোতিবাবু ছুটছেন তদানীন্তন P W D মন্ত্রী R S P'র জ্যাকিদার সঙ্গে আড্ডা মারতে—এ যেন কল্পনাই করা যায় না। বিশেষ করে যতীন চক্রবর্তীর শেষ জীবনের কীর্তিকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে।

হাজতবাস-এর নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে বহু মনীষী তাঁদের চিন্তা ও মনন লিপিবদ্ধ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত সমস্ত গ্রন্থে। জ্যোতিবাবুর বিষয় বলা হয়েছে "What irked him most was the sheer waste of time, the inability to do anything constructive such as maintain and develop contacts" (p. 70)

জ্যোতিবাবুর জেল জীবন সম্বন্ধে অনুমোদিত জীবনীর আর একটি মন্তব্যও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সময়টা হচ্ছে ১৯৬২। চীনের যুদ্ধের জন্য যখন বহু কমিউনিস্ট নেতা একসঙ্গে দমদম জেলে আটকা ছিলেন। "Even within

Jail ideological differences broke up party members into discreet groups One group that of the Hardiners came to be called Piomode group, while the other more pragmatic was known as Jyoti's group" [p 113] জ্যোতিবাবুর এক সময়ের প্রতিপক্ষদেব ধারণা তাঁব বিষয়ে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে এবং Pragmatic বিশেষণটি তাঁব বিষয়ে সুখ্যাতি হিসেবে ব্যবহৃত। ১৯৫৫ সালে প্রথমবাব চীন যাত্রার পর থেকেই অনুমোদিত জীবনীকাব লিখছেন, জ্যোতিবাবু "Reviewed his readding of Communism to Reflect the Reality on the Ground" [p 82] হয়তো এটাই তাঁর Pragmatism এর নিদর্শন।

জ্যোতিবাবুব বাজনৈতিক জীবনেব নিপীড়ন ও বঞ্চনাব তালিকায কতকগুলি মর্মান্তিক ঘটনা আছে। তাঁব সদ্যোজাত প্রথম কন্যার যখন মৃত্যু হয তখন তিনি 'আন্ডারগ্রাউন্ডে'। Career নির্বাচনের বিষযে মতভেদ সত্ত্বেও পিতা ডাঃ নিশিকান্ত বসুব সঙ্গে পুত্রেব সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ ছিল। নিশিকান্তবাবু মাবা যাবার সময়ে জ্যোতি বোস জেলে বন্দি ছিলেন।

যোগ বিয়োগ করলে দেখা যাবে জ্যোতিবাবুর হাজতবাসের চাইতে বিদেশ যাত্রা সংখ্যায ও সময়ের হিসেবে অনেক বেশি। জেলে থেকেছেন পাঁচ দফায় ন্যূনাধিক বছর দুয়েক কি তিন বছব ('৩৬ থেকে '৩৯) বিলেতে ছাত্র জীবনের পব প্রায় পনেব বছর জ্যোতি বোস দেশেব মাটি ছাডেননি। সেই সময়টিতে একেবারে তৃণমূলে একনিষ্ঠ পার্টি-কর্মী থেকে তাঁকে Leader of the Opposition এবং বাম গোষ্ঠির সব চাইতে চটকদার সাংসদ হিসেবে উন্নীত হতে দেখি। পুনর্বার বিদেশ সফব শুরু হয '৫৫ সালে চীন যাত্রা দিযে। তাবপব ষাটেব দশক মোটামুটি চীন, সোভিয়েত দেশ ও কয়েকটি কমিউনিস্ট দেশে যাতাযাতেই কাটে। ১৯৭২ সালটি ছিল কংগ্রেস ও নকশাল হামলায পার্টির চরম সংকটের দিন। ববাহনগর থেকে নির্বাচন জেতাব কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে জ্যোতি বোস নিজের নাম প্রত্যাহাব কবে নেন। সেই হতাশাপূর্ণ বাজনৈতিক পরিস্থিতির কালে প্রথম বিলেত প্রবাসের তিন দশক পরে তিনি লণ্ডনে বিপ্লব দাশগুপ্তব অতিথি হযে সস্ত্রীক সাত সপ্তাহ ছুটি কাটাতে যান। আশিব দশক থেকে তাঁর বিদেশ ভ্রমণেব লক্ষ্যস্থল হযে ওঠে.ইউরোপ আমেরিকার তথাকথিত 'পুঁজিবাদী' দেশগুলি। তাদের মধ্যে আবার ছাত্র-জীবনের স্মৃতি বিজড়িত লণ্ডন শহর

সব চাইতে প্রিয়। যে লণ্ডন শহরে তিনি কমিউনিজমের প্রেমে পড়েছিলেন। অনুমোদিত জীবনীর 'In Love with Communism' অধ্যায় দ্রষ্টব্য!

সত্যব্রত সেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ পান ১৯৫৬ সালে জ্যোতি বোসের ষোল বছর পর। অন্তবর্তীকালে তিনি বিয়ে থা চাকরি-বাকরি করে সাধারণ সাংসারিক জীবন যাপন করেন। চাকরির বিষয়ে বলা যায় তিনি ভারতবর্ষে market research প্রয়োগ ব্যাপারে একজন পথিকৃৎ। যে যুগে তিনি আই এস আই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রূপ দিতে সংস্থাটি একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিল। অশোক সেন, অতীশ দাশগুপ্ত এবং অন্যরা লিখেছেন আই এস আই এর সঙ্গে সত্যব্রত সেন এর সম্পর্ক ও সম্পর্ক-বিচ্ছেদের বিষয়। শাসনের মোহে বিভ্রান্ত না হওয়া, তিক্ততা সৃষ্টি না করে (অতীশ দাশগুপ্তর ভাষায়) "নম্র অথচ ঋজু অবস্থান নিয়ে" সরে আসার ঘটনা সত্যব্রত সেন এর জীবনে বার-বার ঘটেছে। নিউ ইয়র্কে, রাষ্ট্র সংঘের লোভনীয় চাকুরিতে বহাল থাকতে থাকতে তিনি সেখানকার "কর্মচারি সংগঠন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি" হয়েছিলেন। মেয়াদ শেষ হলে কর্মচুক্তির নবীকরণ করেননি।

সুধাংশু দাশগুপ্ত লিখেছেন, "দেশে ফেরার পর বলল চাকরি ছেড়ে দেব, দেশের কাজ করব। আমি বললাম ভালই ত, প্রমোদকে বলি। সত্য বলল ঃ ওভাবে ওপর থেকে আসব না, নিচ থেকে শ্রমিক ইউনিয়ন এর কাজ করে পার্টি সদস্যপদ লাভ করবো। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় অশোক সেন এর সাক্ষ্য ঃ প্রমোদ দাশগুপ্তকে 'তুমি' সম্বোধন করতেন, সত্যব্রত সেন সেই বিরলতমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।"

গড়িয়াহাট সেতুটিকে এককালে তথাকথিত লাল দুর্গের দক্ষিণ দুয়ার বলা হত। ঢাকুরিয়া যাদবপুর অঞ্চলে পার্টি শক্তি গড়ে উঠেছিল দুটি কারণে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিরঞ্জন সেনগুপ্তর মত নেতাদের কাজ ও জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর সংগঠন। জয়া ইউনিয়ন-এর প্রতিষ্ঠায় সত্যব্রত সেন-এর ভূমিকা অনেকেই ভুলতে বসেছেন। বর্তমানকালে এই এলাকা থেকে বামফ্রন্ট এক-এক টুকরে লোকসভা, বিধানসভা, এমনকি পৌর সভারও আসন হারিয়েছে। যতীন চক্রবর্তী বহিস্কৃত হবার পর-পরই বিপ্লব দাশগুপ্ত এক লাখ-এরও বেশি ভোটে হেরে গিয়ে সেবার সম্ভবত একটি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম নির্বাচন-এর মাধ্যমে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত

হয় কেরালায়। পার্টি সদস্য হিসেবে সত্যব্রত সেন-এর কাজের তালিকায় পড়ে ওই সরকার-এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হবার আমন্ত্রণ স্বীকার করা। ই এম এস নাম্বুদ্রীপাদ লিখেছেন "বলা যায় কমরেড সত্যব্রত সেনই হলেন কেরালা রাজ্যের প্রকৃত অর্থনীতি বিভাগ-এর জনক।" ১৯৬৪ থেকে ৭৭ পর্যন্ত তিনি রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি ছিলেন। (পার্টির মুখপত্র 'গণশক্তি'র অবিচুয়ারী লেখক এই তথ্যটি উল্লেখ করতে কসুর করায় পরের দিনে সম্পাদক মশায়কে পত্রাঘাত সহ্য করতে হয়। সুধাংশু দাশগুপ্ত লিখেছেন "১৯৭৭ সালে যখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় তখন প্রমোদ-বাবুই সত্যব্রত সেনকে দিল্লী থেকে নিয়ে এসে বামফ্রন্ট-এর ইকনমিক অ্যাড-ভাইসার এর পদে বসিয়ে দেন · যোগ দিয়েই বলল · বড্ড ভুল করে ফেলেছ··· পঞ্চায়েতই হবে বামফ্রন্ট সরকার-এর মূল ভিত্তি সে-দপ্তর অন্য শরিককে দেওয়া হল' [পৃ ৫] "ছ' সাত বছর বাদে, সরকার-এর অভ্যন্তরে হাজির থাকার আর তাগিদ রইল না, সত্যব্রত সেন সরকার থেকে সরে এলেন [অশোক সেন পৃ ১০]" তিনি সক্রিয়ভাবে পার্টিতে যোগদান-এর পরে কোনও দিন কোন ভাতা গ্রহণ করেননি। তেমনি সরকারি পদে থেকেও বেতন নেননি" [সন্দীপ দে পৃ ৬৫] শেষ পদ ছিল রাজ্যের অর্থ কমিশনএর সভাপতি হিসেবে। এবং শেষ কাজ পঞ্চায়েত বিষয়ে উপদেষ্টা হয়ে পুনরায় কেরল গমন। বিরাশী বছর বয়সে এই যাত্রাই তাঁর অন্তিম আয়ুক্ষয়ের কারণ। নিজের আরাম সুবিধে সম্বন্ধে তিনি সাধারণভাবে উদাসীন ছিলেন। এক সময়ে সত্যব্রত সেন সুট-বুট পরে স্টুডি-বেকার গাড়ি হাঁকাতেন। বাস-ট্রামএর ভিড়ের মধ্যে যারা সকলে তাঁকে চিরকাল দেখতে অভ্যস্ত, পুরোনো চেহারাটা তাঁদের পক্ষে কল্পনা করাই দুরূহ। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, আসন-এর মোহ, লোক মুখে খ্যাতির আগ্রহ (যেগুলির প্রেরণায় জগতের অনেক ভাল কাজও হয়) এ সমস্ত বিষয়ে সত্যব্রত সেন-এর অস্বাভাবিক অনীহা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। সত্যব্রত সেন ও তাঁর সমসাময়িক স্বল্পপরিচিত দেশহিতৈষী, যেমন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী ইত্যাদির কর্ম ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আরও সম্যক পরিচয় লাভ করলে আজকের দিনের ছোট বড় পলিটিশিয়ানদের মধ্যে কোন ধরণ-এর গুণাবলীর চর্চা হলে দেশের পক্ষে মঙ্গল, সে বিষয়ে আমরা আরও সচেতন হব।

জ্যোতিবাবুর বিচারে সৎ কমিউনিস্ট সম্বন্ধে এই উক্তিটি পড়ে ধাঁধা লাগে। "As a matter of fact a consistent communist is a rare specimen

in the country. There are only handful of such leaders. Most Indian Communist leaders had their past career with Congress, Congress Socialist Party, Anushilan, Jugantar and other groups" [p 106]। জ্যোতিবাবু Consistent Communist বলতে কি কেবল আমাদের 'বিলেত ফেরত কমিউনিস্ট'দের দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করছেন ?

দুটি ঘটনার বিষয়ে অনুমোদিত জীবনীকার তখনকার জ্যোতিবাবুর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি ১৯৫৭ সাল-এর Slum Remover Bill। "Basu knew if the bill went through it would leave slum dwellers home-less. He like others dreamed of a clean Calcutta but to achieve the goal, one had to lay out concrete plans... not abrutally raze their shanties" [p 91] দ্বিতীয়টিতে "Basu denounced the high handed demolition of slums at Turkman gate in Delhi, saying that urban renewal was a long and arduous process and could not be done overnight" [p 162]

বইটি যখন ছাপাখানায় ছিল গভীর রাত্রির অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হয় "Operation Sunshine"। তিন হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো দিল্লী শহর-এর মত সবে তিন'শ বছরের ভূঁইফোড় কলকাতায় কোনও প্রাণহানির খবর অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠান যখন চালু ছিল 'হকারদে'র প্রতিবাদ রোখবার বন্দোবস্ত নিয়ে পুলিশকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্টের যে সাফল্য তার দৃঢ় ভিত্তির দুটি বড় কারণ কারও অজানা নেই। প্রথমটি হল সংগঠন, দ্বিতীয় পঞ্চায়েত। পার্টির দুর্দিনে চরম অধ্যবসায় ও তিতিক্ষার সঙ্গে যাঁরা সংগঠনেরকাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও তাঁর সহমীদের নাম স্মরণীয়। ই এম এস বলেছেন '৫২-৫৩ সালের প্রথম পরিচয় থেকেই "কমরেড সেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির মতাদর্শ শিক্ষার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তখনই শুনে-ছিলাম খুব সহজ বাংলায় মতাদর্শগত বিষয়ে কিছু পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, যেগুলি পার্টি-ক্লাস নেওয়ার পক্ষে খুবই উপযোগী। [পৃ ১] এই প্রসঙ্গে সত্যব্রত সেন-এর : কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী, প্রশ্নোত্তরে কমিউনিজম ইত্যাদি পুস্তিকার নাম করা যেতে পারে।

Peoples Democracy-র প্রথম সম্পাদক যে জ্যোতি বসু অনেকেই হয়তো সে কথা জানেন না। কিন্তু শুরু থেকে সাতাত্তর সাল পর্যন্ত ওই কাগজের Economic Notes এর স্তম্ভটি পড়ে সত্যব্রত-সেনএর নাম জানবার অনেক আগে "রঞ্জন চৌধুরী" ছদ্মনামটির সঙ্গে বহু লোকের পরিচয় হয়েছিল। এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন সূর্য মিশ্র, নিরুপম সেন, অরুণ চৌধুরী প্রমুখ।

'শ্রদ্ধাঞ্জলির' ছত্রে ছত্রে স্বীকৃতি আছে যে সত্যব্রত সেন হলেন গ্রাম-বাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অন্যতম রূপকার। অন্যত্র অসীম দাশগুপ্ত লিখেছেন "আমাদের রাজ্যে পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ-এর প্রথম কথাটি যেমন বলেছিলেন কমরেড সত্যব্রত সেন (পশ্চিমবঙ্গে তাঁর শেষ কাজ অর্থ কমিশন-এর রিপোর্ট) এ পর্যন্ত শেষ কথাটিও তিনিই বলে গেলেন।

সত্যব্রত সেন আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন। জটিল বিষয় অল্প কথায় সহজ করে বলার বিরল ক্ষমতা ছিল তাঁর। এই প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। প্রকাশ করাত সত্যব্রত সেন-এর কিছু সুনির্বাচিত লেখা সংযোজন করে দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথমটি হল তাঁর বলার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত সত্যব্রত সেন-এর অজস্র লেখাতেই যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ধ্যান ধারণার স্মরণীয় প্রকাশ, যেগুলি অগ্রথিত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং যা হারিয়ে গেলে দুঃখের কারণ হবে, তা নির্দেশ করা।

এই সূত্রে দেশহিতৈষীতে '৮৫ সালে লেখা "প্রাধান্যের প্রশ্ন" প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"বর্তমানে আমাদের পার্টির কাজের দুটো আলাদা ক্ষেত্র আছে, আলাদা হলেও তারা সম্পর্কিত। একটা হল সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্র, নির্বাচনে দাঁড়ানো লোকের কাছে ভোট চাওয়া। সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে সরকার গঠন করা এবং সরকার চালানো। অন্যটা হল সমাজ পরিবর্তন-এর প্রস্তুতি। এর পরিধি বিশাল। দেশের শোষিত মানুষদের সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা সামন্ততান্ত্রিক যুগের মানবিকতার ভিত্তিতে জাতপাত ধর্মীয় সম্প্রদায় ইত্যাদি যে বিভেদ বাঁচিয়ে রাখে সেই চিন্তাধারাকে কাটিয়ে উঠে শ্রেণীচেতনা নিয়ে আসা, সমাজ পরিবর্তন-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সমাজ বিপ্লবের সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম ও সংগঠন গড়ে তুলতে চেষ্টা করা। দুক্ষেত্রেই মেহনতী মানুষ নিয়ে কারবার। তাদের আস্থা না অর্জন করতে

পারলে কাজ এগোয় না। [পৃ ৮৮]…রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত-এর দিকে না তাকিয়ে কিছু পাইয়ে দেবার ঝোঁক থাকলে অতীতে দেখা গেছে সেগুলি নিছক সুবিধেবাদী সংগ্রাম হয়। [পৃ ৮৯] (Pragmatic শব্দের বাংলা কি সুবিধেবাদী ?)…

এই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষের জন্য 'দেশহিতৈষী'র সম্পাদক সুধাংশু দাশগুপ্ত লিখেছেন "সে প্রবন্ধ নিয়ে পার্টির উচ্চ মহলের কোন কোন কোনায় গুঞ্জন উঠেছিল" [পৃ ৬]।

জ্যোতিবাবু বই-এর মুখবন্ধে লিখেছেন "I am responsible for quotes" এবং নিজের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সম্বন্ধে অনুমোদিত জীবনীর শেষ কথা বলেছেন: "After reaching the summit, you look around and you find there are many more peaks to climb" [p 294]

অনুমোদিত জীবনীর শেষ কথাগুলি অবিনির্মাণ করে আমরা বলতে পারি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর Consistent Communist career এর Everest প্রধান মন্ত্রিত্ব। সে অভিযান যদি বা বিফল হয়ে থাকে রাষ্ট্রপতি ভবনের কৈলাশ শিখর জয়ের আশা এখনও আমরা বাঙালিরা করতে পারি না কি ?

আমাদের দুই কমরেড তাঁদের জীবনে প্রাধান্যের প্রশ্নর কি উত্তর দিয়েছেন হাজার Deconstruction করলেও তার অর্থবিপত্তির সম্ভাবনা নেই। এবং সেই দুই পৃথক উত্তর-এর কোনটি Technomedia-র প্রিয় তার বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের ধারণা ডিকনস্ট্রাকশন গুরু ডেরিডার চেতাবনী সত্ত্বেও সুচীরকাল স্থায়ী ঐতিহাসিক সত্য ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে এবং কালে কালে সর্ববাদীসম্মত একটি রূপ ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুস্তক পরিচয়

১ কমরেড সত্যব্রত সেন : লাল সেলাম
[দেশহিতৈষী
প্রকাশক সুধাংশু দাশগুপ্ত, পৃ ১০৫, মূল্য ৩০

২ Joyti Basu The Authorised Biography
[Viking Penguin India, পৃ 333, মূল্য ৪০০

স্বেচ্ছা নির্বাসিত এক গল্প লেখক

বাংলা ছোটগল্পে পঞ্চাশের দশকে যে-সব লেখক মার্কসবাদী চারিত্র্যযুক্ত কোন পত্রিকায় লেখক রূপে পরিচিতি পাওয়াতেই আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছেন, বীরেন্দ্র নিয়োগী তাঁদের অন্যতম। শুরুরও শুরু থাকে, জীবনের প্রথম গল্পটি প্রকাশ করেছে অগ্রণী, ১৯৪৮ সালে, এমনি স্মৃতি, শুধু বীরেন্দ্র কেন, উত্তরকালে যাঁরা মরু পথে ধারা হারাননি এমন বেশ কিছু এস্টাব্লিশমেণ্ট প্রতিষ্ঠ লেখকও সানন্দে উপভোগ করেন। কারণ বামপন্থী তথা প্রগতিশীলতার সুবিধা কুললক্ষণ-যুক্ত সাহিত্যপত্র সে-সময়ে যেগুলি সেই তালিকায়, পঞ্চাশের দশকের অন্তত প্রথমার্ধ পর্যন্ত, অগ্রণী ছিল শীর্ষস্থানীয়গুলির একটি। পরবর্তী ধাপে পরিচয় পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গল্প লেখকের স্বীকৃতি ছিল এমনি কৌলীন্য যা বামপন্থী শিবিরে' তখনো, এমনকি ষাটের দশকেও, লেখক-পরিচয়ে সার্বিক স্বীকৃতির গ্যারাণ্টি।

বীরেন্দ্র নিয়োগী এই গ্যারাণ্টি ভালোই পেয়েছিলেন। বামপন্থী যে সংগ্রামী মানসিকতা, কলমের মুখে যে মানবিক লড়াই এই লেখকের স্বভাবধর্ম তা তাঁর সব গল্পেই স্বতঃ উৎসারিত। তথাপি যে তিনি সাহিত্য জগতের নেপথ্যে থেকে গেলেন এর জন্য কে বা কাকে দায়ী করবে। শক্তি বা চরিত্রের নির্ভেজালতা তো এ'ব আছে, তবু প্রায় অর্ধশতকব্যাপী সাহিত্যকর্মে ইনি যে বড় জোর গুটি ষাটেক গল্প লিখেছেন তা সৃষ্টির পরিমাণগত বিচারে বেশ কম। এর পশ্চাতে কারণ হয় তো তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য জোরাল তাগিদের অভাব। বিষয়টা আরো দুঃখের হয় যখন জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে মাত্র আটটি গল্প নিয়ে সাহিত্যের দরবারে নিজেকে পেশ করতে হয়। এ দুর্ভাগ্য এবং ক্ষতি এই লেখকের একলার নয়, বাংলাসাহিত্যের পাঠকদের পক্ষেও কথাটা প্রযোজ্য।

'সন্ধানপর্ব' ছোটগল্পের সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আটটি গল্প। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে লেখা গ্রন্থের প্রথম গল্পটি, ১৯৫২ সালে অগ্রণীতে, সবচেয়ে শেষে লেখা শেষ গল্পটি, ১৯৯০ সালে নহবৎ পত্রিকায়। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৪০০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল। মাত্র আট ফর্মা পরিসরে আটটি গল্প সন্নিবিষ্ট।

'জোয়ারের কান্না' এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প তো বটেই, বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে এটি স্থায়ী সম্পদ রূপে গণ্য হবারও যোগ্য। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে, পরিচয় পত্রিকায় (শ্রাবণ / ১৩৬৬ সংখ্যা)। কী এর বিষয়বস্তু ?

কলকাতায় কালীপুজোর ভাসানের রাতে একদঙ্গল ছিন্নমূল কিশোর গঙ্গার এসে জোটে, বিসর্জন-দেওয়া কালীপ্রতিমার কাঠামো কুড়িয়ে কুমোর-পোটোদের কাছে বিক্রির দ্বারা দু-চারদিন তাদের পেটের ধান্দা মেটে। আলিপুর জেলের বিপরীতে বলরাম বোসের ঘাটে কাঠামো কুড়ানিদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, কাদা জলের মধ্যে মা-কালী ধরার জন্য শকুনের মতো ডানার ঝাপটা ঝাপটি, খালের কাদার মধ্যে থপথপ করতে করতে লেংটি-পরা হাড্ডিসার কিশোরগুলির মধ্যে যারা জলের মধ্যে ঝাঁপাই পিটতে বছরের পর বছর হাত পাকিয়েছে তাদের মধ্যে এসে পড়েছে সেদিন আনাড়ি এক উডনদাস, নাম তার মতি, রুগ্না মায়ের ওষুধ কেনার জন্য সে এসে জুটেছে এদের মধ্যে। ভন্টা-নাদুরা প্রথম দর্শনে ওকে একাজে ঘেঁষতে দেবে না মতলব করেছিল, কিন্তু পেটের ধান্দার এই কামড়া-কামড়ির মধ্যেও একই মাটিতে পুষ্ট বড়রা মানবিকতার টানে যেমন করে অন্নের ভাগ দেয় ছোটদের, ভন্টা তেমনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল মতিকে। নিজের গ্রাস থেকে সে মতিকে ছেড়ে দিয়েছে একটা প্রতিমা। প্রতিমার মাটি ছাড়ানোর জন্য এই লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার নিজের কাটারিটাও সে নিজে থেকে ধার দিয়েছে মতিকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে বোঝে মতির মা আছে, মায়ের জন্যই মতি অজানা এই ভয়ংকর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখনই ভন্টা নির্দয় বিদ্বেষে কেড়ে নিয়েছে কাটারি এবং তার সহায়তার হাত। কেন ?

সেটাই এই গল্পের বিষয়বস্তু, কাঠামো কুড়ানো এই গল্পের পরিপ্রেক্ষিত। পেটের জ্বালায় যে-সব মা শুধু ঘরসংসার না, সন্তান ছেড়েও পতিতাবৃত্তিতে পালায় তেমনই সব মায়েদের অনাথ সন্তানেরা ছিল কাঠামোকুড়ানিদের দলে। ভন্টা তেমনই সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয় এক কিশোর। ভক্তিগদ্গদ নরনারীর মা-মা ডাকের মধ্যে বিসর্জিত জগন্মাতা কালীপ্রতিমা থেকে কাটারির ঘায়ে মাটি ছাড়াতে সেখানে ভন্টা যেন "দেখতে চেষ্টা করছিল ঐ প্রতিমাটার মধ্যে কোথায় মা লুকিয়ে আছে। নাকি সবই শুধু মাটি আর খড়। সব, সবখানেই ওই মাটি, খড় আর রং চং।" বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সন্তান ফেলে পালানো মায়েদের সন্তানদের ব্যর্থ মাতৃকামনার স্বরূপ এই গল্পটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে। ভাবে ও ভাষায় চিরন্তন এক সৃষ্টি।

১৯৭৭ সালে লিখিত 'নির্বাসনে আছি' এবং ১৯৮৩ সালে লিখিত 'বাতিল' গল্প দুটিও পড়তে গিয়ে মন একাগ্র হয়। প্রথমটির বিষয়বস্তু খোলা মনের এক-যুবক কেরানি থেকে জীবন শুরু করে পরে প্রমোশনের দরুন অফিসার হয়ে গিয়ে কিভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল, চাকরিতে কৌলীন্যলাভ তার জীবনে যে ছন্দপতন ঘটাল, জীবনের সেই ব্যর্থতাবোধ গল্পটিকে মূল্যবান করেছে। অপর গল্পটির বিষয়বস্তু বার্ধক্যের বিড়ম্বনা, সমস্যাটি চিরপুরাতন হওয়া সত্ত্বেও নিত্যনূতন স্বাদ এ-গল্পটিতেও মেলে।

আশায় থাকব এই লেখকের অন্তত আরও একটি সংকলনের যার মধ্যে তাঁর পূর্ণতর পরিচয় বিধৃত থাকবে। কোন গ্রন্থপ্রকাশক কি এই দায়িত্ব নিতে পারেন না যিনি বা যাঁরা এঁর গল্পগুলির সন্ধান করবেন এবং মূল্যবান গল্পগুলিকে গ্রন্থাকারে বাঁচিয়ে রাখবেন ?

সত্যপ্রিয় ঘোষ

সন্ধানপর্ব। বীরেন্দ্র নিয়োগী ॥ ক্রান্তিক প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩। দাম ২৫ টাকা।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক আপসমুখী আন্দোলনঃ বিকাশ, চরিত্র ও তাৎপর্য

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরাজের স্বার্থরক্ষা করার জন্য সুচতুর ব্রিটিশ রাজ-নীতিবিদ্ ও প্রশাসকগণ যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন বেশ কিছু ভারতীয় দেশীয় রাজা-রাজড়া এবং দেহবর্ণে ভারতীয় অথচ মননে ব্রিটিশ ভারতীয় আমলা-বৃন্দ। এদের সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জমিদারবর্গ ও উদীয়মান শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যাঁদের সঙ্গে অনেক ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার সুসম্পর্ক ছিল। এঁরা ভারতে ব্রিটিশরাজের পক্ষেই কাজ করতেন নিজ নিজ স্বার্থের কথা

ভেবেই। অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও নিষ্পেষনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অধীর হযে পড়েছিলেন এবং জীবনপণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমে পড়েছিলেন ভারতের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, ছাত্র ও যুবশক্তি এবং কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের দল, এবং শেষমেশ মহিলারাও। স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা ও কার্যক্রম নিয়ে মতভেদ ছিল নেতাদের মধ্যে, বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে। সুতরাং মত ও পথের স্বাতন্ত্র্যকে ভিত্তি করে স্বাধীনতার আন্দোলন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। বিচিত্র সব ব্যক্তিত্ব ও ধারণা এই সামগ্রিক সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনকে প্রবাহিত করেছিল। একদিকে উচ্চশিক্ষিত-উচ্চবিত্ত স্বাদেশিকগণ চেয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজত্বের মধ্যেই কিছু পরিমাণে আত্মস্বাতন্ত্র্য। আর অন্যদিকে দেশ-মাতৃকার শৃংখলমোচনে বদ্ধপরিকর তরুণ জাতীয় বিপ্লবীরা চেয়েছিলেন বল প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে। সংগ্রামের শেষ পর্বে দেখা যায় শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বামপন্থী আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে দেশের বাইরে থেকে সশস্ত্র অভিযান। সব মিলিয়ে নড়বড়ে করে দেয় সাম্রাজ্যবাদের ভিত। চতুরতার ও কূটনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের ভারতীয় বন্ধুদের চিনে ফেলেন এবং "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" নীতি অনুসরণ করে তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যান। বিচিত্র এই ইতিহাসের একটি দিকের নাতিদীর্ঘ মনোগ্রাহী আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়।

নিয়মতান্ত্রিক-আপসমুখী আন্দোলনের বর্তমান আলোচনা তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ। গ্রন্থকারের ভাষায়: "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি নাতিদীর্ঘ, সহজবোধ্য ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বামপন্থী জননেতারা প্রায়ই বলে থাকেন। বর্তমান গ্রন্থটি লেখার প্রথম উৎসাহ প্রধানত তাঁদের বক্তব্য থেকেই পাওয়া যায়।" ইতিহাসের বিকৃতি করার প্রবণতা যে বিপজ্জনক সে কথা স্মরণ করে গ্রন্থকার ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর নির্দিষ্ট কাজে অনেকাংশে সফল হয়েছেন। এ যাবৎ প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সাহায্য নিয়েই তিনি তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। এ ধরনের কাজে শতকরা একশ ভাগ মতৈক্য সবার সঙ্গে সব সময় হতে পারে না কিন্তু সেজন্য বর্তমান গ্রন্থটির মূল্য কিছুমাত্র কমেনি।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণের যে দিকটা প্রশংসনীয় তা হল ইতিহাসের ঘটনা বিচারে তাঁর যতদূর সম্ভব তথ্যনির্ভর ও মোহমুক্ত থাকার চেষ্টা। জিন্নাহর ভূমিকাকে ও গান্ধীজীর প্রভাবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করেও তাঁদের সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একইভাবে চিত্তরঞ্জনের ও সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্ব স্বীকার করেও তাঁদের নেতৃত্বের সাময়িক দোদুল্যমানতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সুরেন্দ্রনাথ নাওরোজীর বক্তব্যকে যেমন যথাযথ পরিবেশন করেছেন তৎকালীন পরিস্থিতির আলোকে, তেমনই নেহরু প্যাটেল-আজাদের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন তৎকালীন রাজনীতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। গ্রন্থটির 'প্রস্তাবনা' শীর্ষক অধ্যায়টি সুলিখিত এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক এর থেকে যত বেশি সরাসরি বক্তব্য পাবেন তার চেয়েও বেশি উপকৃত হবেন গ্রন্থকারের বক্তব্যের তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা কোন বিশেষ চিন্তা পদ্ধতির সরু গলিতে না ঢুকে সাধারণ যুক্তিবাহী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রশস্ত রাজপথ অনুসরণ করেছে। নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ অন্য কোন ধারায় হতে পারত বা বিশেষ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তা করা যেতে পারত। কিন্তু তাতে বক্তব্যের স্বচ্ছতা কতটা আসতে পারত তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ ভঙ্গি ও ভাষার স্বচ্ছতা তাঁর বক্তব্য পরিবেশনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম যে এই ধরনের নাতিদীর্ঘ অথচ চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ থেকে খুবই উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে পড়তে পড়তে একটা কথাই মনে হয়েছে যে, অনেক জায়গায় বোধহয় আর একটু বিস্তৃত আলোচনা ও গভীরতর বিশ্লেষণ গ্রন্থটির মূল্য বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। তাতে গ্রন্থটির আয়তন কিছু বাড়ত, সেই সঙ্গে আলোচনার পূর্ণতাও বৃদ্ধি পেত। গ্রন্থটির শেষ অধ্যায় পড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ বসে ভাবতে ইচ্ছা হয়, এটা একটা বিশেষ চিত্তাকর্ষক দিক। খুব শীঘ্রই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে এ ধরনের আশা করা অন্যায় নয়। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত মুখবন্ধটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, মূল্য ঃ ৫৫ টাকা।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতার সংগ্রামী অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ

অমল সেন দুই বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রেই সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চেয়ারম্যান অমল সেন তিরাশি বছর বয়সেও অতি সম্প্রতি ঘুরে গেলেন কলকাতা সহ পঃ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তেভাগা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে পঃ বঙ্গের কৃষক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে অমল সেনকে আরো অনেকের সঙ্গে সংবর্ধিত করা হল। এর তিন বছর আগে ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে অমলবাবুর পঃ বঙ্গবাসী গুণমুগ্ধ ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় তাঁর আলোচ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গে' গ্রন্থটি।

অধুনা নড়াইল ও তৎকালীন যশোর জেলায় জিতেন সেন ও চন্দ্রমুখী দেবীর পুত্র অমল সেন-এর জন্ম ১৯১৪ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার বছরটিতেই। স্বভাবে লাজুক কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ সৈনিক অমল সেনের স্বদেশসেবার কাজ শুরু সেই ছাত্রজীবন থেকেই (১৯২৮)। তরুণ বয়সে যুব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে বিশ্বাসী হন। তবে ১৯৩৪ সালে যখন যশোর-খুলনার কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, তখন থেকেই অমল সেন এর শরিক হয়েছিলেন এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে চলেছেন। রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে অবস্থান—অমল সেন-এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র বৈশিষ্ট। তাঁর রচনাবলীতেও তার ছাপ সুস্পষ্ট।

১৯৪৫ সালের নড়াইলে অমল সেন-এর নেতৃত্বে কয়েকটি গ্রামে ভাগচাষীরা প্রথম তেভাগার দাবি আদায়ে সক্ষম হন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে স্বাধীন নড়াইল গণপ্রজাতন্ত্র গঠিত হয় তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন অমল সেন। স্বাধীনতার সংগ্রামে ও মানুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অবিভক্ত বাঙলায় ও পূর্ববঙ্গে তিনি মোট ১৯ বছর কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৯৭১-এ জেল থেকে বেরিয়ে ভারতে এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। অকৃতদার এই মানুষটির ভারতীয়

উপমহাদেশের প্রবীণতম একজন কমিউনিস্ট নেতা রূপে আজও সক্রিয় ও নিজ আদর্শ রূপায়ণে একজন প্রত্যয়ী মার্কসবাদী।

স্বাভাবিকভাবেই এমন একজন নেতৃত্বের রচনায় তাঁর সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল থাকবেই। বিবিধ প্রসঙ্গে গ্রন্থটি এর ব্যতিক্রম নয়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত পাঁচটি বড় প্রবন্ধের সংকলন একশো আশি পৃষ্ঠার পরিসীমাবদ্ধ আলোচ্য এই বইটি। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, আলোচনা যোগ্য, বিতর্কিত ও আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে তিনটি মাত্র নিবন্ধ। যথা : ১ নড়াইলের তে-ভাগা সংগ্রামের সমীক্ষা (পৃঃ ১-৩৭) ; ২ কমিউনিস্ট জীবন ও আচরণরীতি প্রসঙ্গে (পৃঃ ৩৮-৫৫) এবং ৩ কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শগত বিতর্ক প্রসঙ্গে (পৃঃ ৯৭-১৭৮)।

অপর দুটি নিবন্ধ হয়তো আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে খুবই মূল্যবান রাজনৈতিক দলিল রূপে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের একটা অংশের কাছে সমাদৃত হয়েছিল—কিন্তু বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে বলতেই হয়, মহাফেজখানার রেকর্ড ছাড়া এগুলির বর্তমান সময়ের পক্ষে আজ তেমন কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। 'জনগণের বিকল্প শক্তি (জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব)' এবং 'বিশ্ব সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে' নিবন্ধ দুটি আজ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎসাহী ছাত্রদের কাছে ছাড়া অন্যত্র পাঠযোগ্যতা হারিয়েছে বলেই মনে হয়। এর মধ্যে প্রথম নিবন্ধটিতে তবুও ১৯১৭ সালের রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লেনিনবাদী রণনীতি ও রণকৌশলের ও 'শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম' সম্পর্কিত কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা কৌতূহল জাগালেও 'বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে' রচনাটি আজ একেবারেই বাতিল। কারণ এর প্রথম তিন লাইনের আপ্তবাক্য হল : "সমাজ বিজ্ঞানীরা বর্তমান যুগকে সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগ তথা সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ বলে নির্দেশ করে থাকেন। তত্ত্বগতভাবে এ মূল্যায়ন সমাজবিজ্ঞানীদের জগতে সর্ববাদীসম্মত বলা চলে।" তারপর যেভাবে রচনাটি জুড়ে দেশবিদেশে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাফল্য ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কগুলির গৌরবগাথা (নাকি 'অগৌরব !') সাড়ম্বরে বর্ণিত তা আজ প্রাচীন ইতিহাসের আর্কাইভাল মেটেরিয়াল মাত্র।

তুলনায় অন্তত বিশ বছর পূর্বে রচিত হলেও কমিউনিস্ট জীবন ও আচরণ-রীতি প্রসঙ্গে' ও 'আদর্শগত বিতর্ক প্রসঙ্গে' দলিল দুটি এখনো যুগোপযোগী

রয়ে গেছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে। 'কমিউনিস্ট জীবন ও আচরণরীতি' জাতীয় রচনার প্রয়োজনীয়তা মার্কসবাদীদের মধ্যে আজ যেন একটু বেশি করেই অনুভূত হচ্ছে। তাত্ত্বিকদের অনুমান হয়তো সঠিক যে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের জন্য মার্কসবাদ বা লেনিনবাদের ভুল-ভ্রান্তি আদৌ দায়ী ছিল না—দায়ী ছিল কমিউনিজমের শর্তাধীন আচার-আচরণ-জীবন বোধ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা থেকে ওই দেশের কমিউনিস্ট পার্টির তথাকথিত নেতা ও কর্মীদের চরম বিচ্যুতি। কমিউনিস্টরা যদি একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের মতো ব্যবহার না করে—তা হলে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের দশা কি হয় রোমানিয়া, আলবেনিয়া তার প্রমাণ নয় কি? বিপ্লবের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও গণ চীনের ও বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার কুড়ি বছর পরে পঃ বঙ্গের কমিউনিস্টদের 'শুদ্ধিকরণ অভিযান' চালু করতে হয় এই কারণেই। লি-শাও চির 'সাচ্চা কমিউনিস্ট কি করিয়া হইবে' নামক অমূল্য গ্রন্থটির আদলে রচিত অমল সেন-এর এই নিবন্ধটিতে নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিচ্ছুরণ ঘটেছে।

অমল সেন-এর গ্রন্থটির শেষ নিবন্ধটিকে (প্রায় আশি পৃষ্ঠার) নিঃসন্দেহে 'ওয়ার্কার্স পার্টি অব বাংলাদেশে'র কর্মসূচী কর্মনীতি সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলিল বলা চলে। স্তালিনবাদী পার্টি এবং সমদূরত্ব রক্ষাকারী স্বাধীন নীতি ও কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের এই দলটির সঙ্গে আমাদের দেশের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্য অনেক কাছা-কাছি। তবে স্তালিনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়েও তারা যেমন সজাগ ছিলেন, তেমনি সজাগ ছিলেন (অন্তত সেই সময়ে) রাশিয়া ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র আনুগত্য থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে। সুতরাং এই স্বাধীন দৃষ্টি-ভঙ্গির নিরিখে সেই সময়কার সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আন্তর্জাতিক বিতর্কগুলি অমলবাবু বিশ্লেষণ করেছেন বলে—তা আজও আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। তবে এই রচনাটির সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ মূল্যায়ন এবং মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাভাগে বিভক্ত (মূলতঃ তিন ভাগের কথাই বলেছেন—মার্কসবাদী পিকিংপন্থী ও স্বতন্ত্র ওয়ার্কার্স পার্টি) কমিউনিস্টরা ঠিক কী ধরনের মতাদর্শগত রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তার বিস্তারিত পাঠ। অবশ্য এ জাতীয় তাত্ত্বিক আলোচনার পূর্বে 'আমার কথা'য় লেখকের অনুভবই সঠিক—"বিপ্লবী তত্ত্বকে যখন জনগণ আত্মস্থ করেছেন

তখনই মাত্র সেই তত্ত্বশক্তিতে পরিণত হয়। তার আগ পর্যন্ত তত্ত্ব থাকে বন্ধ্যা।"

এবাব এই গ্রন্থের সেরা রচনাটিব প্রসঙ্গে আসি। বস্তুত বইটির দুর্লভ সম্পদ অমল সেন-এব এই নিবন্ধটি। 'নড়াইলেব তে-ভাগা সংগ্রামের' বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা ছিল খুবই কম। উত্তরবঙ্গের তে-ভাগা আন্দোলন নিয়ে ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত গ্রন্থগুলিতে প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের অনেক বিবরণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তে-ভাগার অপর ঝটিকা কেন্দ্র পূর্ববঙ্গের যশোব-খুলনা ও অন্যান্য অঞ্চল বিষয়ে বিস্তারিত অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের এখনও যথেষ্ট অভাব। 'নড়াইলেব তে-ভাগা সংগ্রামের সমীক্ষা' লিখে ওই আন্দোলনেবই অন্যতম সেনাপতি অমল সেন এমন সব মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা কবেছেন যা বাঙলাব তেভাগা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় প্রভূত সাহায্য করবে।

নড়াইল মহকুমায (যশোব জেলার অংশ) তে-ভাগা আন্দোলনের বিবরণ লিপিবদ্ধ কবাব যে আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অমলবাবু ব্যবহাব কবেছেন—ইদানীংকালে তে-ভাগা সংগ্রামের ইতিহাস রচনাব দেশি-বিদেশি গবেষকরা এই মেথডই অনুসবণ করছেন। অমল সেন যে বিষয়গুলিব উপর অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত করেছেন সেগুলি হল ঃ—(১) নেতৃত্ব ; (২) সামাজিক-বাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ; (৩) পূর্বতন আন্দোলনের বুনিয়াদ, (৪) আশু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, (৫) সিদ্ধান্ত (৬) সংগঠন ; (৭) ফলাফল-আর্থিক সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক (৮) উত্তরাধিকার।

যথাযথ কারণেই পঃ বঙ্গের কৃষক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা তে-ভাগা কৃষক সংগ্রামকে আজ অর্ধশত বছরের ইতিহাস রূপে চিহ্নিত করলেও অমল সেন কিন্তু 'তে-ভাগা'কে ইতিহাস রূপে আজও দেখতে পাচ্ছেন না; অন্তত বাংলাদেশেব পবিপ্রেক্ষিতে। কারণ; সেখানে কৃষক সমাজ আজও তে-ভাগা হাসিল করার জন্য লড়ছেন। 'তে-ভাগা' এখনও বাংলাদেশের কৃষক সমাজ ও কমিউনিস্ট পার্টিব একটি সংগ্রামী অ্যাজেন্ডা বা কার্যক্রম। অমলবাবুও সেভাবেই প্রসঙ্গটি আলোচনা করলেও তাঁর বচনা থেকে ১৯৩০-এ যশোরে প্রথম তে-ভাগাব ডাক এবং ১৯৪৫ সালে তে-ভাগা আদাযেব বিবরণ ভাগচাষী আন্দোলনের জ্বলন্ত ইতিহাস রূপেই আজও পাঠক সমাজের কাছে প্রতিভাত।

প্রকাশক যথার্থ কাবণেই গ্রন্থটি সম্পর্কে যা বলেছেন সেটাই সত্য ঃ সরাসরি

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে লেখা না হলেও এদেশের পাঠকদের কাছে বইটি কখনই অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত কর্মী, মার্কসবাদ নিয়ে গবেষণারত গবেষক এবং উপমহাদেশের রাজনীতি নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ বইটির মধ্যে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান খুঁজে পাবেন।*

সুস্নাত দাশ

* বিবিধ প্রসঙ্গে। অমল সেন। শুভানুধ্যায়ী। ১৬নং মেইন রোড ইস্ট, নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা ; মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা ॥

রবীন্দ্র-সখা, পরিচয়-সুহৃদ পৃথ্বী সিংহ নাহার

আমাদের দেশে এবং বিদেশেও কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে নিয়ে জীবনী রচনার সময় তাঁর বৌদ্ধিক পরিপার্শ্বের কথা জানতে আমরা অভ্যস্ত।

অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী রচনার সময় জীবনীকার তাঁর পিতৃ-মাতৃ নাম উল্লেখ ভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের বয়নকর্ম, তার ফুলকারী নকশাগুলিকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন। অনেক সময় এদের সন্তান-সন্ততি ও নিকট-আত্মীয়েরা সর্বৈব অসহযোগিতা এবং অনুদারতা দেখায়।

'জ্যোতির্ময় পৃথ্বী সিংহ নাহার' গ্রন্থে এক ব্যক্তিত্বকে তাঁর কালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের তথ্যের পাশাপাশি তাঁর পারিবারিক পূর্বজ এবং উত্তর-সূরি আত্মীয় ও সন্তানদের ফটো ও পরিচয় সহ বহু মূল্যবান পারিবারিক নথিপত্র ও দলিল।

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাক-কথন' অংশটি প্রয়াত পৃথ্বী সিংহ নাহারের চরিত্রের ও কর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরে। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কথায় "লক্ষ্মীর কোলে সহজ আশ্রয় পেয়ে তিনি নিশ্চিত আরামে, বিলাস-ব্যসনে জীবন অতিবাহিত করেননি···তার পরিচয়ও উৎকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর নানা সাহিত্যকর্মে।"

এই গ্রন্থের পরবর্তী 'জীবন কথা' অংশটি সম্ভবত যৌথ পারিবারিক উদ্যোগে লিখিত। এই প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি যে রাজস্থানের প্রাচীন পারমার বংশের খড়্গ সিংহ ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে জগৎ শেঠের অনুরোধে ভাগীরথী তীরে আজিমগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। পৃথ্বী সিংহের পিতা পূরণচাঁদ নাহার (১৮৭৫-১৯৩৬) ছিলেন বাংলাদেশের জৈন সমাজের প্রথম (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের) স্নাতক। পরবর্তীকালে তিনি এম এ এবং আইন পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। 'সেকালের পণ্ডিতমণ্ডলীর অনেকেই ছিলেন পূরনচাঁদের সুহৃদ।' তাঁদের মধ্যে ভাণ্ডারকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ দে, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত হালদার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এ প্রবন্ধে জানতে পারি যে পূরণচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র কেশর সিংহ ছিলেন 'বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তৃতীয় পুত্র সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট গান্ধিবাদী ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার স্বনামধন্য।

কনিষ্ঠ পুত্র বিক্রম সিংহ পেশায় প্রযুক্তিবিদ হলেও কে, এল, সায়গল, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গে চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি তিমির বরণের সঙ্গীত গোষ্ঠীতে কিছুদিন বেহালা বাজাতেন।

এই সমৃদ্ধ পারিবারিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতে পূরণচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র, এ গ্রন্থের মুখ্য ব্যক্তিত্ব, পৃথ্বী সিংয়ের (১৮৯৮-১৯৭৬) সাহিত্যকর্ম, কলা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণকে অনুধাবন করতে সুবিধা হয়। পৃথ্বী সিংহ ১৯১৬ সালে হেয়ার স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে আই. এ এবং ১৯২০ সালে ইংরাজি অনার্স সহ বি, এ পাস করেন। শিক্ষক হেরম্ব মৈত্রের সঙ্গে মত পার্থক্যের কারণে এম এ পঠন স্থগিত রেখে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

পৃথ্বী সিংহ বাল্যবন্ধু সৌমেন ঠাকুরের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর বাড়ির বিশিষ্ট জনদের সাথে পরিচিত হন। 'সবুজপত্র', 'পরিচয়' গোষ্ঠির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'পরিচয়', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি ইতিহাস, চিত্রকলা, সংগীত, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে নানা বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ লেখেন।

তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাটি নানান পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, রবীন্দ্রনাথ,

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলালের শিল্পকর্ম এবং রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি, কয়েকটি রবীন্দ্র-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের একমাত্র মৃৎ-শিল্প কর্ম ছিল তাঁরই সংগ্রহে।

পৃথ্বী সিংহের ব্যক্তিত্বের অন্যতম উজ্জ্বল দিক হ'ল : পিতা অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি জৈন ধর্মের বেড়া ভেঙে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এবং পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরীতে বসবাস করেন। এইভাবে নিজেকে এবং পুত্র-কন্যাদের ব্যাপকতর প্রেক্ষিতে এনে উপস্থিত করেছিলেন।

তাঁর রচনা কর্মের আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তাঁর দিনলিপি। এর কিছু অংশ তাঁর সরল ও অকপট ভাবনা-চিন্তার প্রতিচ্ছবি।

চিঠিপত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ক্ষেত্রটি ঈর্ষণীয়। তথাপি এই পত্রগুলি পাঠ করলে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করবেন যে কোন চরিত্রগুণে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমা, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রদ্যোৎ-কুমার ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তী, মুকুল দে, সাহানা দেবী, দিলীপকুমার রায়, সোমনাথ মৈত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত-ভাবে এবং পত্রে যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

তাঁর অনেকগুলি কবিতা তাঁর যুগের সাহিত্য গুণমানের নিরিখে উত্তীর্ণ বলেই সহৃদয় পাঠকের মনে হবে। তাঁর লেখা অনেক কবিতা এবং শ্রীঅরবিন্দের কবিতার বাংলা অনুবাদ পাঠ করে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজিতে 'Fine' এবং 'Very fine' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়েছেন।

এ গ্রন্থটির কয়েকটি প্রবন্ধ পরিশিষ্ট অংশে যুক্ত হয়েছে, আমাদের মা : সুজাতা নাহার (পৃথ্বী সিংহের কন্যা), মা ও মাসিমা : যুগল শ্রীমল (পৃথ্বী সিংহের ভগ্নী-পুত্র), শান্তিনিকেতনে পৃথ্বী সিংহ : সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয় সিংহ নাহার লিখিত আজিমগঞ্জের নাহার এবং সর্বোপরি সম্পাদক নির্মল সিংহ (পুত্র) সহ পারিবারিক উদ্যোগে ও শ্রমে লিখিত জীবনকথা প্রবন্ধটি গ্রন্থটিকে এক অন্য স্বাদ এবং মাত্রা দিয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে আরও কয়েকটি প্রীতিপ্রদ সংযোজনের মধ্যে নির্মল সিংহ সহ চার পুত্রের সাক্ষর সংগ্রহ এবং ছোটো ছোটো কবিতার অংশ সহ প্রথিতযশা ব্যক্তিদের আশীর্বাণী আমাদের আনন্দ দেয়। এঁদের মধ্যে আছেন মুস্তাক আলি, ধ্যানচাঁদ থেকে কে. এল সায়গল, শচীনদেব বর্মণ, বিধানচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা। কবিতার অংশ সহ এঁদের আশীর্বাণী উপহার দিয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীদিলীপকুমার রায়, কবি নিশিকান্ত প্রমুখ অনেকে।

পৃথ্বী সিংহের পরিবারের পূর্বজনগণের (পিতামহ, পিতামহী, মাতা, পিতা), সমসাময়িক আত্মীয়, বন্ধু, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের এবং উত্তরসূরিদের বহু যৌথ ও একক পারিবারিক চিত্রে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। একটি মূল্যবান বংশ লতিকা এবং কয়েকটি পারিবারিক নথিপত্র ও দলিল গ্রন্থটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশের উপরোক্ত সংযোজনগুলিতে কোনো বাহুল্য ও প্রচার প্রবণতা দেখতে পাইনি। বরং পাঠকের উপলব্ধি করতে সুবিধে হবে যে একটি 'গোঁড়া' জৈন পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ হয়েও পৃথ্বী সিংহ কী ভাবে তাঁর নিজ চরিত্রবল ও গুণে এক বৌদ্ধিক মনীষা ও উদারতায় বঙ্গ সংস্কৃতির মূল স্রোতে সপরিবারে যুক্ত হয়েছিলেন।

গ্রন্থটির গঠন ও মুদ্রণ এবং সম্পাদনা উচ্চমানের। মাত্র দু-চারটি মুদ্রণ প্রমাদের জন্য শুদ্ধিপত্র সংযোজন করে সম্পাদকমণ্ডলী যে ত্রুটি স্বীকার করেছেন অনেক সুবিখ্যাত প্রকাশকও সযত্নে তা এড়িয়ে যান। আশা করা যায়, এঁদের এই মিলিত সবান্ধব পারিবারিক প্রচেষ্টা আগামী দিনে জীবনচরিত রচনা ও প্রকাশনা প্রচেষ্টাকে স্বাদু ও সুপেয় হতে সাহায্য করবে।

রথীন্দ্র ঘোষ

জ্যোতির্ময় পৃথ্বী সিংহ নাহার / সম্পাদক ঃ নির্মল নাহার। প্রকাশক ঃ মীরা অদিতি সেন্টার, ৬২, শ্রীরঙ্গ টি, কে, লে আউট সরস্বতীপুরম, মহীশূর-৯, দাম—২০০্।

মৈত্রীর কণ্ঠস্বর

ভারত-পাকিস্তান পঞ্চাশ বছরের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কিন্তু কখনোই এদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বরং পরপর তিনবার পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াতেই এদের সম্পর্কের তিক্ততা বোঝা যায়। এই সন্দেহ, অবিশ্বাস বা তিক্ততার সম্পর্কটিকেই প্রায় চিরস্থায়ী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সরকারি স্তরে যে এই স্থিতাবস্থা ভাঙার একেবারে চেষ্টা হয়নি তা নয়। তবে যে কোনো কারণেই হোক তা খুব একটা স্থায়ীরূপ পায়নি। আবার সরকারি গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে দু দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষের পরস্পরকে চেনার ও জানার উদ্যোগও সম্প্রতি চোখে পড়বে। ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় পাক-ভারত জনমঞ্চের তৃতীয় সম্মেলন তার সর্বশেষ নিদর্শন। আলোচ্য সংকলনটিরও প্রকাশ ঘটেছে সেই উদ্যোগকেই স্মরণ রেখেই।

পাকিস্তানের তিনজন কবি ও তিনজন গল্পকারের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা সংকলনের পাঠকদের একটা বড় লাভ। অনুবাদকদের দক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়। তবে প্রবন্ধ চারটির গুরুত্ব আলাদা। কেন না এদের মধ্য দিয়েই একটি অপরিচিত পাকিস্তানকে খুঁজে পাওয়া যায়। কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে জানা যায় যে কিভাবে সেখানকার উইমেনস অ্যাকশন ফোরাম (ওয়াফ) হুদুদ অর্ডিন্যান্স ফর অ্যাডালট্রি-র মতো বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে, সামরিক শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। জয়া মিত্র হিউম্যান রাইটস্ কমিশন-এর মুখপত্রে প্রকাশিত HRCP-র চেয়ারপার্সন আসমা জাহাঙ্গীরের একটি চিঠির অনুবাদ করেছেন। কিভাবে পাকিস্তানের আদিবাসী অঞ্চলে মেয়েদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই চালাচ্ছেন এবং এর জন্য তাদের কি বিপদের মুখে পড়তে হচ্ছে চিঠিতে তার উল্লেখ আছে।

অপরদিকে অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় সরকারি গণ্ডির বাইরে উভয় দেশের মানুষের পরস্পরকে চেনার ও বোঝার যে বেসরকারি প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর নিত্যানন্দ ঘোষ পাকিস্তানে মোহাজির আন্দোলনের উৎস ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে ওই উপমহাদেশে জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। সব মিলিয়ে এটি এমন

একটি সংকলন যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এখনো সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি, আশা করবার মতো এখনো কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে।

ভারত পাকিস্তান মৈত্রী সংকলন ॥ সম্পাদনা সলিল বিশ্বাস, নিত্যানন্দ ঘোষ ॥ নবান্ন প্রকাশনা ॥ পনেরো টাকা ॥

রবীন্দ্র গবেষণার উল্লেখযোগ্য প্রয়াস

সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণভাবে যাকে মধ্যযুগ বলা হয় আলোচ্য গ্রন্থে তাকেই 'প্রাগাধুনিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিশেষণটি গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। কারণ প্রায় পাঁচশো বছরকে মধ্যযুগ বললে বোধ হয় সমস্ত পর্বটির তাৎপর্য বোঝানো যায় না। বিশেষ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী নিশ্চয় এক নয়। অথচ প্রাগাধুনিক বললে দুটি কালকেই একসূত্রে গাঁথা হয়। অর্থাৎ আধুনিকতার লক্ষণগুলি যেখানে অনুপস্থিত তাই প্রাগাধুনিক। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সমালোচকেরা অনেকেই রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর বহু প্রবন্ধে, কবিতায়, এমন কি ছোটগল্প উপন্যাসেও সুযোগমাত্রই বৈষ্ণবপদ কাজে লাগিয়েছেন। এই গ্রন্থের লেখক ডঃ অনিলকুমার রায় হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতেও তাঁর এই প্রীতির সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। বৈষ্ণবতত্ত্ব ও দর্শনকে তিনি উপেক্ষা করেন নি, কিন্তু তার নতুন ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। 'পদাবলীর আন্তরিক রসমাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি—এই স্বীকৃতিই ডঃ রায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

প্রথম বয়সেই যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে আচ্ছন্ন তার প্রমাণ 'ভানুসিংহের পদাবলী।' কিন্তু লক্ষণীয় এই যে চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবত তিনি বারবার পড়েছেন। আবার একই সঙ্গে বৈষ্ণবকর্তাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ

পরিচয়ও ঘটে গেছে। কিন্তু তাঁর সমস্ত ব্যাখ্যাই তো আলাদা। তাই কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ব্যাকুল রাধিকার গৃহত্যাগকে তিনি 'আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকার'' অসীমের আনন্দ ও আহ্বানে উতলা হয়ে ওঠার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি' পাঠে জানা যায় যে বাল্যকালেই তাঁর পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যের কাছে তিনি অনেকগুলি পাঁচালীর গান শিখেছিলেন। মুকুন্দের চণ্ডী-মঙ্গল সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্তব্যেও এ সম্পর্কে তার গভীর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাবে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা' ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস অথবা ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের নিদর্শন ডঃ রায়ের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে যুক্তিসম্মত। এই প্রসঙ্গেই মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মূল কাঠামোটিও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করে গিয়েছিলেন, 'সাহিত্যের ইতিহাস বাংলাদেশের সামাজিক রাষ্ট্রিক ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত' হয়েছে বলেই ডঃ সুকুমার সেনকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অথচ পরবর্তীযুগে গোপালহালদার, অরবিন্দ পোদ্দার বা ক্ষেত্র গুপ্তের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া এই নির্দেশটিকে তেমন গুরুত্ব কেউই দেন নি।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিলেন, তবে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখে ছিল, তাই এই দুজনের কাব্যবৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনায় তাঁকে অনেকবারই প্রবৃত্ত হতে দেখি। এছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউলগান প্রভৃতির প্রভাব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। আর একটি মূল্যবান আলোচনা হল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের যে একটি স্বতন্ত্র মানদণ্ড ছিল আলোচনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন কি, কবিগান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তিক্ত মন্তব্যটিও তিনি উপেক্ষা করেন নি। এছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পাদনা, সংকলন ও অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাও এখানে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত।

সব মিলিয়ে গ্রন্থটি গতানুগতিক রবীন্দ্র-আলোচনা নয়। এই তরুণ গবেষক-নিষ্ঠা ও পরিশ্রম নিয়ে একটি স্বল্প আলোচিত বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। তাই সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। ভূমিকায় অধ্যাপক

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে বর্তমান আলোচনায় লেখকের 'মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।' এটাই গবেষকের ধর্ম।

সমস্ত গ্রন্থটিতেই গবেষকের এই ধর্ম পালিত হয়েছে বলেই তা স্বতন্ত্র-উল্লেখের দাবী রাখে।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ॥ ডঃ অনিলকুমার রায় ॥ চ্যাটার্জী পাবলিশার্স ॥ পঞ্চাশ টাকা ॥

রামমোহন ও বেঙ্গল হরকরা

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিন রকমের মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত, সংরক্ষণশীল হিন্দুদের মত। এই মতে রামমোহন হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী পাষণ্ড। দ্বিতীয় মত ব্রাহ্ম মত। এই মতে রামমোহন দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ। তৃতীয় মত অর্বাচীন মার্কসীয় মত। এই মতে রামমোহন এক ব্যবসায়ী এবং জমিদার ও দালাল মাত্র। একমাত্র দ্বিতীয় মতই ইতিবাচক। কিন্তু তার মৌল ভিত্তি ভ্রান্ত। তা হলে সত্য নির্ণয়ের উপায় কি? আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই প্রশ্ন তুলেছেন। তথ্যবিচারে লেখকের প্রধান সূত্র বেঙ্গল হরকরা নামক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলি।

বরুণ দে একদা একটি প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে, রামমোহন প্রধানত জমিদারদের স্বার্থের কথাই ভেবেছেন। কৃষকদের স্বার্থ তাঁর কাছে গৌণ ছিল। বরুণবাবুর বিচারে তিনি ছিলেন এক ধরনের "হুইগ" জমিদার। কিছুটা উদারতা তাঁর ছিল, তবে তা ছিল সীমাবদ্ধ উদারতা। সুমিত সরকার এবং অশোক সেন ভেবেছেন যে, রামমোহন র‍্যাডিক্যাল ছিলেন না। তাঁর এই ব্যর্থতা বেঙ্গল হরকরাতেও সমালোচিত হয়। অরবিন্দ পোদ্দারের মতে ব্রিটিশদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই রামমোহন ভারতে সাহেবদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলেন। লেখক এই সব মত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, এইরূপ মূল্যায়নই শেষ কথা হতে পারে না। এতে অনেক ত্রুটি আছে। বরুণ দে মৌল ঐতি-

হাসিক উপাদান ব্যবহার করেননি। সুমিত সরকার বেঙ্গল হরকরাকে একটি "বামপন্থী" পত্রিকা রূপে দেখেছেন। এটা ভুল। অশোক সেনের এবং অরবিন্দ পোদ্দারের আলোচনায় নানা রকমের অনুপপত্তি এবং অস্পষ্টতা আছে। এঁরা মার্কসবাদী ঐতিহাসিক রূপে সুপরিচিত। এঁদের রামমোহন সমীক্ষা বহুলাংশে ভ্রান্ত। দুই একটি জায়গায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মতের উল্লেখ থাকলেও গ্রন্থটিতে প্রধানত মার্কসীয় বিচার খণ্ডিত হয়েছে। আরও মনে হয় যে, ঐতিহ্যসম্মত ব্রাহ্ম বিচারধারাকে সমগ্র আলোচনায় মেঘনাদের মত অদৃশ্য, অথচ দুর্বাধর্ষ করে রাখা হয়েছে। এই মেঘনাদের দুর্নিবার প্রভাব থেকে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত রক্ষা পাননি। তিনিও রামমোহনের ঔপনিবেশিক তত্ত্ব জোরাল ভাষায় সমর্থন করেন।

অথচ, ঠিক সেই জন্যই আলোচ্য গ্রন্থে পক্ষপাতদোষ এসে গেল, এমন ভাবার কারণ নেই। লেখকের আলোচনার প্রধান ভিত্তি তথ্য। লেখকের যুক্তির ঠাস বুনোট লক্ষণীয়। প্রায় প্রতিটি বাক্যই যুক্তি। কিন্তু সিদ্ধান্ত যুক্তিজালে ঢাকা পড়ে। এটাই প্রধান অসুবিধা। বেঙ্গল হরকরা যে সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয় তা তথ্য এবং যুক্তি দিয়ে দেখান হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ এই ধরনের দুরভিসন্ধিপূর্ণ অত্যন্ত বাচাল সাহেবি পত্রিকার কথাকে বেদবাক্য মনে না করলেই ভাল করবেন। লেখক সর্বত্রই রামমোহনের কথার, এবং রামমোহনবিষয়ক কথার প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য খুব পরিশ্রম করেছেন। এই প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

লেখকের সমগ্র আলোচনা থেকে প্রধান যে দুইটি সিদ্ধান্ত উৎসারিত হয় তা হল এই ঃ প্রথমত জমিদার হলেও রামমোহন জমিদারি শোষণ সমর্থন করেন নি। কৃষকদের যাতে সুবিধা হয় তা তিনি ভেবেছিলেন, এবং তার জন্য কলম ধরেছিলেন। দ্বিতীয়ত দেশের স্বার্থেই তিনি শিক্ষিত এবং ভদ্র সাহেবদের এদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলেন। এ বিষয়ে তার অনেক শর্ত ছিল। তিনি নিরঙ্কুশ ঔপনিবেশিকতার সমর্থক ছিলেন না। এ বিষয়ে তিনি বেঙ্গল হরকরার বিরোধী ছিলেন।

আমি নিজে রামমোহনের গুণমুগ্ধ। তাঁর মত মানুষ তখন আমাদের দেশে আর তো কেউ ছিলেন না। এমন মানুষ পরেও আর জন্মগ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু কোন মানুষই তো নিখুঁত হতে পারেন না। ইতিহাসের বিচারে মানুষের ভাল মন্দ দুই-ই দেখতে হয়। লেখকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে একমত

হয়েও প্রশ্ন করি ঃ যিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত কাজ করলেন, সেই রামমোহন নিপীড়িত কৃষকদের স্বার্থে মাঝে মাঝে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করা ছাড়া কিছু করে দেখালেন না কেন? কি ভাবে চলত তাঁর চিরস্থায়ী জমিদারি? লেখকের এমন বিশদ যুক্তিপূর্ণ আলোচনাতে এই গুরুত্ববহ প্রশ্নের উত্তর তো পেলাম না। জমিদার উদারনীতির কথা বললেন। তাই তিনি ভাল হয়ে গেলেন? দ্বিতীয়ত, এ কথা কেমনে ভুলি যে, রামমোহন শর্ত আরোপ করেও এ দেশে সাহেবদের চিরস্থায়ী কলোনি করার প্রস্তাব দেন? ভদ্র শিক্ষিত সাহেব বলতে তিনি যে ঠিক কাদের বুঝিয়েছিলেন, তাও তো স্পষ্ট নয়। তাঁদের এদেশে না বসিয়েও কি ইওরোপ থেকে সেকুলারিজম্‌কে, উদারনীতিকে, জ্ঞানবিজ্ঞানকে, উন্নত টেকনলজিকে আনা যেত না? এ সব আমাদের দেশে নিয়ে আসার জন্য আন্দোলন করা কি রামমোহনের মত প্রভাবশালী লোকের পক্ষেও নিতান্ত অসম্ভব ছিল?

তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত ইয়োরোপিয়ানদের ভারতে নিয়ে আসার যে যুক্তি পূর্বে উল্লিখিত দ্বিতীয় মতে সর্বদা প্রাধান্য পায়, তার অসারতা, তার নিরঙ্কুশ দাস্যভাব তখনও স্পস্ট ছিল, এখনও স্পস্ট। ভারতীয় জাতীয়তাবাদে, স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই ঔপনিবেশিক যুক্তি বর্জিত হয়েছে। রামমোহনের ভুল বিচারকে ভুল বিচার বলাই বোধ হয় ভাল।

রমাকান্ত চক্রবর্তী

রমেন্দ্র মিত্র রামমোহন ও বেঙ্গল হরকরা ঃ প্রাইমা পাবলিকেশনস ॥ ৬০ টাকা।

এই সময়ের নাটক

'সমসাময়িককালের ঘটনাবলী আমাকে যখন যেভাবে নাড়া দিয়েছে নাটকের মাধ্যমে তা তুলে ধবার চেষ্টা করেছি মাত্র।' নাট্যকার মৃদুল সেন তাঁব 'একজন কমিউনিস্ট এবং' নাট্য সংকলন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটিও এতেই স্পষ্ট হযে উঠেছে। নাটককে তিনি নিছক বিনোদনেব ব্যাপাব বলে মনে কবেন না, নাটক তাঁব কাছে সমকালের কণ্ঠস্বর। তাই বলা যেতে পারে সমকালই যেন তাঁব আলোচ্য পাঁচটি ছোট নাটকেব মধ্য দিযে কথা বলে উঠেছে। এক অর্থে সমযই এই নাটকগুলির নাযক।

যে সময়টিকে নাট্যকাব আলাদা আলাদাভাবে তাঁব নাটকে ধবতে চেযেছেন তা দ্বান্দ্বিক-সংঘাতে পূর্ণ। একদিকে সুস্থ সমাজ ও জীবনকে গড়ে তোলার লড়াই, অপরদিকে দুর্নীতি বা অবক্ষযের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ। বহুদিনেব পবিচিত বিশ্বাসের ভিত্তিমূলেই যেন ফাটল ধবেছে। এক দলেব কাছে এই ভাঙনটাই চূড়ান্ত, আর অপরদিকে কিছু কিছু মানুষ এই ভাঙনকে প্রাণপণে অস্বীকাব করার চেষ্টা করে এমন কি জোড়া লাগাতেও। মৃদুল সেনেব সবকটি নাটকেই এই ভাঙনের সুস্পষ্ট চেহারাটি যেমন আছে তেমনি তাকে অস্বীকার করবার দৃঢ়তাও আছে। সংঘাত ছাড়া নাটক হয় না। এই আলো-অন্ধকারের লড়াই-ই নাটকগুলিতে গতি এনে দিয়েছে, চরিত্রগুলিকে সজীব কবেছে। কোনো নাটকই ফর্মুলা মাফিক একমুখী হয়নি। তা শিল্পেব সব শর্তই পালন কবেছে।

কয়েকটি উদাহরণ দিলেই এই নাটকগুলিতে আলো-অন্ধকাবের লড়াইয়েব চেহাবাটি স্পষ্ট হবে। আমাদের চারপাশের জগৎই নাট্যকারকে সাক্ষ্য প্রমাণ যুগিযেছে, বিষযের জন্য তাঁকে অন্ধকারে হাতড়াতে হয়নি। তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন যে সুরেন্দ্রমোহনের মতো শ্রদ্ধেয মার্কসবাদী নেতা অথবা দেবব্রতের মতো সৎ কমিউনিস্টদের ঘরে শুভব্রতদের মতো লোভী প্রোমোটারবাও জন্ম নিচ্ছে (একজন কমিউনিস্ট এবং) ডঃ অমর সেনের মতে অর্থপিশাচ ডাক্তাবদেরই এখন সমাজে প্রবল প্রতিপত্তি (ধন্বন্তরী), বাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্রের মিলিত ষড়যন্ত্রে লাভজনক পাবলিক সেক্টরের ইউনিটগুলিকে মাল্টিন্যাশনালদের হাতে

তুলে দেওয়া হচ্ছে (হস্তান্তর)। তাছাড়া তাঁর আরও মনে হয়েছিল যে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের নায়কেরা যে রক্ষণশীলতা বা অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তার অবসান আজও ঘটেনি (আলোর পথযাত্রী)। আর কৃষণ চন্দরের বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে রচিত 'ইউক্যালিপটাসের শাখা' নাটকেও তিনি দেখান যে ডাঃ আসগর স্বাস্থ্য দপ্তরের যে ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর পালিত পুত্র ডাঃ মাসুদকেও সেই একই দুর্নীতির সামনে দাঁড়াতে হয়।

কিন্তু এরই পাশাপাশি প্রতিটি নাটকেই জীবনানন্দ কথিত এই "অদ্ভুত আঁধারকে" দূর করবার প্রাণপণ সংগ্রামের চিত্রটিও উপস্থাপিত হয়। নিজের মনোভাবটিও নাট্যকার গোপন করেন না। বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতেও তিনি রাজি নন। আবার এই ধরনের লড়াইয়ে মাঝে মাঝে যে হার হয় না তাও নয়, কিন্তু সে পরাজয় ক্ষণিকের। ভূমিকায় চমৎকার বলেছেন নাট্যকার-অভিনেতা অশোক মুখোপাধ্যায়, এই সব পরাজয় আসলে বড় এক জয়ের ইঙ্গিত নিয়ে আসে। তাই শেষ পর্যন্ত দেবব্রত, সীমা বা ডঃ সুনির্মল সেনরাই মাথা তুলে দাঁড়ায়, প্রতিপক্ষেরা নয়। প্রথমেই জয়ের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করলে তা নাটক না হয়ে স্লোগান হয়ে যেত। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে জীবনের যেখানে প্রতিষ্ঠা সেখানেই নাটকের সৃষ্টি। এই অর্থেই মৃদুল সেনের রচনা শিল্পসার্থক নাটক। আর যে সমস্ত নাটকে তত্ত্ব এভাবে জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে তা অনায়াসেই মঞ্চসফল হবে এ ব্যাপারে সমালোচকের মনে কোনো দ্বিধা থাকে না।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

একজন কমিউনিস্ট এবং ⋯ ॥ পাঁচটি ছোট নাটক সংকলন ॥ মৃদুল সেন ॥ সমাজ ঃ কলকাতা-৯ ॥ পঁচিশ টাকা।

আজাদহিন্দ ফৌজের কোর্টমার্শাল ও গণ-বিক্ষোভ

নেতাজী শতবর্ষ এবং ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের প্রাক্কালে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ সময়োচিত বলে মনে হয়। লেখক প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসবিদ। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার এবং অকেন্দ্রিক গণবিক্ষোভের ওপর খণ্ড-বিক্ষিপ্ত ভাবে লেখা আগে অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু যতদূর জানা আছে এবিষয়ে সম্পূর্ণ ও পৃথক একটি গ্রন্থ কেউই রচনা করেননি হয় ইংরেজী নয় বাংলায়। অথচ ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির শেষ পর্বের ইতিবৃত্তকে সম্যক রূপে তুলে ধরতে গেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচার-এর তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না কোনক্রমেই। ভূমিকায় লেখক তাই বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেই বলেছেন যে, সামরিক অর্থে আজাদ হিন্দ বাহিনী অসফল হলেও এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ভারতের অভ্যন্তরে ছিল তীব্র এবং অব্যবহিত। প্রকৃতপক্ষে এই বিচার-এর ফলে আমাদের দেশে যে প্রবল ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া ও স্বতোৎসারিত গণবিস্ফোরণ দেখা যায়, তা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ রাজশক্তির ভারত-ত্যাগকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ভারতীয় রাজনীতি ও ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ গবেষকদের অবশ্যই জানা আছে যে, এই বিষয়ে রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদান মোটেই সহজলভ্য নয়। তবুও গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব তথ্যনির্ভর করে তোলার জন্য ভারতে প্রাপ্তব্য যাবতীয় উপাদান অর্থাৎ সরকারি বিবরণী, নথিপত্র এবং প্রামাণিক গ্রন্থ-প্রায় সবকিছুই লেখক দেখেছেন। তাছাড়া সাহায্য নিয়েছেন India Office সংগ্রহশালার যাবতীয় নথিপত্র এবং Transfer of power papers-এরও। সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি থেকেও তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করেছেন এবং নেহরু মিউজিয়াম এর মূল্যবান দলিলগুলিও তাঁর নজর এড়ায়নি। শুধু সমরবিভাগের সংরক্ষিত ফাইলগুলিও দীর্ঘকাল ধরেই অনধিগম্য—এটা এবিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটা মস্ত বড় সীমাবদ্ধতা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে অধ্যায় বিন্যাস সুচিন্তিত। যথা : প্রথম অধ্যায়টিতে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ওঠার কাহিনীটি সবিস্তারে বিধৃত করেছেন। মূলতঃ সাধারণ পাঠকের মুখ চেয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আজাদহিন্দ-এ ফৌজের

কোর্ট মার্শাল ও এব্যাপাবে সরকাবি সিদ্ধান্তের নেপথ্য ইতিহাসের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। অর্থাৎ শাসক-শক্তির মধ্যেও বিচাবাধীন আজাদি সৈনিকদের সম্পর্কে সঠিক কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল এবং লেখক তাও আমাদের গোচবে এনেছেন। বলতে গেলে এই অধ্যায়টি গ্রন্থটিব সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বিচারপর্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষেব যাবতীয় সওয়াল জবাব। বাস্তবিক নেতাজী বিশেষজ্ঞদেব কাছে বিচারেবই এই আনুপূর্বিক কাহিনীটি যথেষ্ট মূল্যবান। শুধু সাধাবণ উৎসাহী পাঠকদেব কাছে নয়। সর্বশেষ অধ্যাযটিতে এই আজাদী সেনানীদেব ঐতিহাসিক বিচাবজনিত অভূতপূর্ব গণ-বিক্ষোভেব কাহিনী বিবৃত হযেছে। এই অধ্যায়টি বস্তুত যেমন সুবিস্তৃত তেমনি আলোকসঞ্চাবী। সমঘামযিক ভাবতের বাজনৈতিক পবিস্থিতি, দলগত ক্রিযা প্রতিক্রিযা, সাম্রাজ্যবাদী শাসকদেব চুলচেরা হিসাব-নিকাশ, সবকিছু এই অধ্যাযে বিবেচিত হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে দেশেব প্রধান বাজনৈতিক দলগুলি এই বাহিনীব বিচাবকে ব্যাবহাব কবতে চেযেছিল, তাব চরিত্রকেও লেখক প্রায সম্পূর্ণরূপে উৎঘাটন করেছেন। গ্রন্থটিব পবিশিষ্টে সবকাবিবিরোধী পক্ষেব ব্যবহাবজীবী, ভুলাভাই দেশাই-এব তথ্যসমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ হযেছে আক্ষবিকভাবে।

বাস্তবিকপক্ষে কলিকাতার তিনদিনেব উত্তাল এই আন্দোলনেব চবিত্রবিশ্লেষণ কবে ভাবতসচিব প্যাথিক লবেন্স-এব কাছে তৎকালীন বড লাট ১৯৪৫-এব ২৭শে নভেম্বব যে চিঠিটি দেন তা যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য! পশ্চিম বাংলাব লাট সাহেব কেসীব বক্তব্যেব সঙ্গে সহমত হযে বড লাট লিখেছেন সে প্রস্তুতিবিহীন, নেতৃত্ববিহীন, জনগণেব এই প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পেছনে যে ব্রিটিশবিবোধী মানসিকতা কাজ করেছিল তা যেমন তীব্র তেমনি সুগভীর। এই আন্দোলনের অসাম্প্রদাযিক চবিত্রটি বিভেদকামী বাজশক্তিকে যথেষ্ট ত্রস্ত কবে তুলেছিল, বড় লাটের চিঠিতে সেই ইঙ্গিত বযেছে। কোলকাতাকে কেন্দ্র কবে ছাত্র শ্রমিক-জনতাব শাহরিক অভ্যুত্থান বস্তুতপক্ষে একমাত্র ১৯২১-এর গণরোষের সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পাবে। লেখক এও বলেছেন শক্তির সঙ্গে কোলকাতার নিরস্ত্র মানুষের যে অসম লডাই এবং মরণ প্রতিরোধ আমাদের মনে করিয়ে দেয় ফবাসি বিপ্লবের সমযকার ব্যাবিকেড বিপ্লবের কথা। প্রত্যক্ষ সঙ্গীরাও এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছিলেন যে, কোলকাতার তখন একটা গ্রাম-বিপ্লবের পরিস্থিতি অন্তত

কয়েকদিন ধরে বিরাজ করেছিল। আজাদী সেনানীদের বিচারের প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে গণরোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে তা একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এখানকার ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের (শরৎ বসু ও কিরণশংখ রায় সমেত) দ্বিধাগ্রস্ততা চরিত্রটি প্রকোটিত হয়েছেন নির্ভুলভাবে। এই অভূতপূর্ব গণজাগরণে ত্রস্ত হয়ে নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের অত্যুৎসাহিতাকে ধিক্কার জানান এবং শাসক শক্তিকে তোষণের চেষ্টাও করেন সাধ্যমতো। দেশের প্রধান রাজনৈতির দলগুলির নেতৃবৃন্দ গোড়ার দিকে আজাদী বাহিনীর শৌর্য্য ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করলেও (তাতে মুখ্যত নির্বাচনের মুখ চেয়ে) শেষে কিন্তু তাদের স্ববিরোধীতা প্রকাশ করেন এদের স্বপক্ষে জনগণের প্রতিবাদের পদ্ধতিকে নিন্দা করে। লেখকের মতে শাসক-শক্তি একই সঙ্গে নিজেদের সৃষ্ট এই বিপর্য্যয়কে যেমন এড়াতে চেয়েছিলেন, তেমনি দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আরো কয়েকজন সেনানীর বিচার-এর ব্যবস্থা করে নিজেদের জিদ রক্ষা করতে তৎপর হয়েছিলেন সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার জন্য। যে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং দলমত নির্বিশেষে সংহত প্রয়াস, আজাদী বাহিনী বিচারের প্রতিবাদ আন্দোলনে দেখা দিয়েছিল, তা একমাত্র সিপাহী বিদ্রোহের সময় শেষ দেখা গিয়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই শেষ লড়াই-এ অরুণা আসফ আলি তাৎপর্য্য পূর্ণ ভাবে ডাক দিয়েছিলেন ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের। নৌবিদ্রোহের ফলশ্রুতি স্বরূপ এবং মূলত আজাদী ফৌজের ক্যাপ্টেন বুহরহানউদ্দিনের উপর জারি করা দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদে এবং নৌসেনাদের দাবির সমর্থনে—স্থানীয় সিগন্যাল ফোন এবং মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল। এরা অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় ব্যাবসায়ী সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থে দোকানপাট বন্ধ করে দেয় এবং বলে যে এটি সিপাহী বিদ্রোহের আরেকটি সংস্করণ মাত্র। কিন্তু উল্লেখ্য যে ধর্মঘটি সেনারা সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করেন এবং তাঁদের মিছিলে সব দলের পতাকা সমানভাবে ওড়ানো হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিকৃত স্বার্থকামী রাজনীতিক ও ব্যাবসায়ীরা এই গণ-আন্দোলনের বৈপ্লবিকতাকে স্তব্ধ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যান প্রতিশ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের আশায়। অর্থাৎ দেশের ভিতরে ও বাইরের প্রতিক্রিয়াশীলরা বিদেশী শাসকের, সুরে সুর মিলিয়ে সদ্য উদ্ভূত এই গণ-জঙ্গীয়ানাকে সমূহ বিপজ্জনক বলে মনে

কবেছিলেন। মনে কবেছিলেন হয়ত এই কাবণেই যে, ১৯২১ এর পর কলকাতাব মুসলমান সমাজ ইতিবাচক বাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনে এবপবে আব কখোনই শামিল হননি। লেখক আমাদের এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে দিল্লির অ্যাংলো অ্যাবাবিক কলেজ এবং অন্যান্য মুসলিম বিদ্যালযের ছাত্রবা এই গণবিক্ষোভের শামিল হয়েছিল নির্দ্বিধায়।

জাতীয়তাবাদী মুখপত্রে সমর্থক প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গটি লেখক সঙ্গতভাবেই টেনে এনেছেন। বস্তুত তৎকালীন সংবাদপত্রেব পাতায় (কযেকটি সংবাদপত্র ছাড়া) সিংহভাগ তখন জুড়ে থাকত ব্রিটিশবিবোধী আন্দোলনেব কাহিনী। বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতেও সবিস্তারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিবোধী আন্দোলনেব গতিপ্রকৃতি উল্লেখিত হয়েছিল!

কলকাতার গণজাগরণের উত্তেজনা, লেখকের ধারণায়, বহিবঙ্গকেও স্পর্শ কবেছিল—বিশেষ কবে ক্ষুদ্রশ্রেণীর আমলা ব্যবসাযী তথা শ্রমিকদের আন্দোলন-মুখী আচবণে। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে প্রদত্ত বেতাব বক্তৃতায় একাধিকবার বলেছিলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরাজিত হলেও, অদূবে ভবিষ্যতে ভাবতের অভ্যন্তরে শেষ স্বাধীনতার যুদ্ধের এই প্রযাস গণমনকে উন্মোথিত করবে। অধিকন্তু ঐসব বেতার বক্তৃতায় তিনি ব্রিটিশ ভারতীয বাহিনীয কাছেও আবেদন জানান যেন তারা অচিবেই নিজেদেয় আনুগত্য ও সহর্মিতা প্রকাশ করেন আজাদী বাহিনীর স্বপক্ষে। তিনি ভবিষ্যৎবাদী কর্যেছিলেন যে, আজাদ হিন্দ সরকার ও বাহিনীর দৃষ্টান্তে ভাবতীয়বা উদ্বুদ্ধ হবে এবং অসফল প্রমাণিত হযেছে বাজকীয বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীয একাংশের ঐতিহাসিক ধর্মঘটেব মাধ্যমে। আজ একথা নির্দ্বিধায বলা যায যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিযাব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেব প্রভাব যে দ্বিতীয যুদ্ধোত্তব ভারতে ক্রিয়াশীল হয তা আই এন-এর দাক্ষিণ্যে। ব্রিটিশ সরকাবের তরফে কর্নেল বেঙ্ক-এর নেতৃত্বে যে অনুসন্ধানী বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাব থেকে জানা যায যে, আজাদ হিন্দ বাহিনীব উচ্চপদস্থ কর্মচাবীরা বিশুদ্ধ দেশপ্রেমেব দ্বারাই উদ্ভুদ্ধ হযেছিলেন। এই বাহিনীর সৈনিকদের ঐতিহাসিক বিচাবের সওয়াল জবাবেব মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে আর এন নিছক তাৎক্ষণিক একটা আজ্ঞাপালনকাবী বাহিনী মাত্র ছিল না।

"আদালতের রায়" ও "গণবিক্ষোভ" শীর্ষক অধ্যায়ে ডঃ রায় চৌধুরী

আমাদের জানিয়েছেন যে, এই ফৌজের বিচার হয়েছিল ব্রিটিশ আইনানুযায়ী —সেনাদের কাঙ্ক্ষিত আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী নয়। এরকম অপপ্রচারও চালনা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর অনুগত সৈনিকরা নাকি বিদ্রোহী আজাদি সেনাদের শাস্তিবিধানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে এই অপপ্রচারকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাজানুগত সৈনিকরাও এই বিচারের প্রতিবাদে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুখর হয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে, বিচারের প্রহসনকে বজায় রাখতে এবং একই সঙ্গে সরকারের মুখরক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সে সময়ে অতিমাত্রায় সচেষ্ট ছিল।

আরেকটি বিষয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য, তা হল, মার্কিন সেনাদের প্রতি জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের উগ্র প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৫-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কাচরাপাড়া থেকে আগত আমেরিকান সৈন্য বোঝাই ট্রাকের উপর জনগণ আক্রমণ চালায় ব্যারাকপুরের কাছে। এর দুদিন আগে পাঁচটি আমেরিকান ট্রাকে জনগণ অগ্নিসংযোগ করে, আমেরিকান বাহিনী লেফটেন্যান্ট গারাট জনতার হাতে প্রহৃত হন। অর্থাৎ প্রায় সর্বত্রই মার্কিন সৈন্যেরা জনগণের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এবং ফলত মার্কিন সৈন্যবাহিনী ব্রিগেডিয়ান জেনারেল উইলসন ঘোষণা করেন যে গণঅসন্তোষ দমন করার জন্য আমেরিকান বাহিনীকে আর কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

লেখক সাম্প্রতিক Indian Annual Register উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, এই বিচারকে কেন্দ্র করে কলকাতার মুসলমান সমাজ যে ধরনের রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখান তা একমাত্র ১৯২১-এর আন্দোলনের সময় দেখা গিয়েছিল। অধিকন্তু রসিদ আলীর মুক্তির দাবিতে কলকাতার ট্রামশ্রমিকরা ধর্মঘট করে। খুবই লক্ষ্যণীয় যে, কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সকলেই এই বিচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল এবং শান্তি-মিছিল বের করে উত্তেজনার প্রশমনও ঘটাতে চেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলমান লীগ যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল এবং গণউত্তেজনাকে যেকোন প্রকারে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরকারের মুখপাত্ররা স্পষ্ট ভাষায় তা ঘোষণা করেছিলেন। সন্দেহের কারণ নেই যে, সরকারি মহল ভারতীয় জনগণের এই জঙ্গী মেজাজকে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী বলে অভিহিত করেছিলেন। বাস্তবিক ২১শে নভেম্বর ১৯৪৫ এর ফেব্রুয়ারির যুগান্তকারী নৌবিদ্রোহের পরই

১৯৪৬-এর আগস্টে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাল। আরেকটি বিষয়ে লেখক পাঠকদের গোচরে এনেছেন। তা হল করাচি মাদ্রাজ এবং জব্বলপুরে ঘটেছিল নৌবাহিনীর এক বৃহৎ অংশের উপর আজাদ হিন্দদের প্রভাব। এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাদের প্রতিবাদের ভাষা থেকে। নৌবাহিনীর বিদ্রোহী সেনাদের দাবির সমর্থনে স্বাধীন সিগন্যাল কোর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মীরা অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন চালালেও স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কিন্তু এটিকে আরেকটি সিপাহী বিদ্রোহ ধরে নিয়ে দোকান পাট বন্ধ করেছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী ও বিকৃত স্বার্থকামী ব্যাবসায়ী শ্রেণী সম্পূর্ণ শ্রেণী স্বার্থে এই আন্দোলনে ত্রস্ত বোধ করে, যদিও এর পিছনে ছিল বাহ্যিকভাবে সব দলের সমর্থন।

উপসংহারে লেখকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে পাঠক হয়ত অনেকটাই সহমত হবেন। সেটা হল এই যে, লড়াই এ হেরেও যুদ্ধে কিন্তু নেতাজী ও তাঁর বাহিনী জয় লাভ করেছিল। নিজে অনুপস্থিত থেকেও সুভাষচন্দ্র হয়েছিলেন সর্বত্র গামী। এছাড়া এটাও মানতে হবে যে, এই ক্ষণস্থায়ী আবেগ সংজাত আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে আমরা যে অনুপম শৌর্য ও মহৎ স্বার্থত্যাগ লক্ষ্য করেছি; তার তুলনা প্রায় মেলে না।

ল্যাডলীমোহন রায়চৌধুরী

দেজ পাবলিশিং। ১৯৯৬ মূল্য—৬০ টাকা।

সৌরি ঘটক

নিত্য অভ্যাসবশত বুধবার (২৭১৭) আকাশবাণী-র সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের বাংলা সংবাদ শুনছি। দিল্লির পর স্থানীয় সংবাদ। একেবারে শেষের সংবাদটি যে এত মর্মান্তিক হবে তা কি জানতুম! আগের দিন সন্ধ্যায় 'পরিচয়' দপ্তরে বসে সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্তের সঙ্গে যাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কথা হচ্ছিল তিনি যে সেই সময়ের কিছু আগে বা পরে চিরতরে চলে গেছেন তা জানার জন্য পরের দিন আকাশবাণীর সংবাদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। সংবাদটি হল, "কথা-সাহিত্যিক সৌরি ঘটক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এস এস কে এম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।"

সংবাদটি শুনে চমকে উঠলাম। কত দিনের সম্পর্ক। কত কথা মনের মধ্যে ভিড় করে এসে জড় হল। সৌরিদা শুধু আমার কমরেড ছিলেন তাই নয়, তিনি আমার পরিবারের বন্ধু ছিলেন।

সৌরিদাকে প্রথমে জেলখানায় দেখি, পরে ১৯৭১ সালে 'কালান্তর-'এ আবার দেখা হল। তখন থেকেই আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা গভীর হতে থাকে। তিনি 'কালান্তর'-এ ডেস্কে বসে কাজ করেন। সকলের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত তাঁর রসিকতা। তিনি খোশ-মেজাজে আড্ডা মারতে পারতেন। কিন্তু নীতিগত প্রশ্নে এই মানুষটাই হয়ে উঠতেন অন্য মানুষ। স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করতে কখনই কুণ্ঠিত হননি।

সৌরিদা যে বছর কালান্তরে এলেন সেই বছর শারদীয়া সংখ্যা বেরুনোর আগে যখন সংখ্যাটি নিয়ে পরিকল্পনা চলছে তখন শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদক প্রয়াত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় জানালেন যে এবারের এই সংখ্যায় সৌরিবাবু উপন্যাস লিখবেন। কেউ কেউ কিছুটা বিস্মিত হলেও দ্বিমত প্রকাশ করেননি। সকলেই একমত হলেন। দীপেনবাবু শারদীয়া সংখ্যার জন্য প্রথম যে বিজ্ঞাপনটি দিলেন, তাতে লিখলেন—"কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী সৌরি ঘটক এবার উপন্যাস লিখছেন।" বিজ্ঞাপনটি বেশ কয়েক দফা প্রকাশিত হল। সৌরিদা লিখলেন, "কমিউনিস্ট পরিবার।"

ইতিপূর্বে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তাঁব 'কমবেড' উপন্যাসটি তাঁকে সাহিত্যিকেব আসনে বসিযে দেয। পবে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী কমরেড শাহেদুল্লাব প্রেরণায় সৌরিদা 'নন্দন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হযে বেশ কিছু লেখা লিখেছেন। তিনি 'আন্তর্জাতিক' পত্রিকাতেও কযেকটি মূলবান প্রবন্ধ লিখেছেন। 'পবিচয়'-এব সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্তেব অনুবোধে সৌরি ঘটক "স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক" শীর্ষক একটি ধারাবাহিক স্মৃতিকথা লিখেছেন। সাধাবণ মানুষের সংগ্রামী জীবন আলেখ্যধর্মী তাঁর এই ধাবাবাহিকটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়া তিনি 'কালান্তর' দৈনিক ও সাপ্তাহিকে বেশ কিছু গল্প ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এক সমযে তিনি 'কালান্তব' সাপ্তাহিকে কিশোবদেব পাতাও চালাতেন।

তাঁর সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে কোন কোন মহলে সংশয থাকলেও বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক নীবেন্দ্রনাথ রায়, বণেশ দাশগুপ্ত এবং কবি ও লেখক বিমল ঘোষ সৌবি ঘটককে সাহিত্যিকেব মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। অধ্যাপক নীবেন্দ্রনাথ বায় লিখেছেন, "অবণ্যেব স্বপ্ন' আমাব মত অনেক পাঠকের মনে থাকিবাব কথা। কাবণ গল্পটি একবাব পডিলে কাহাবো পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়, ইহাই আমাব ধাযণা। আমাব পবিচিত মহলেব অনেককে ইহা পাডিয়া শুনাইয়াছি আমি, এবং দেখিয়াছি আমাব উৎসাহেব সাড়া তাহাদের অন্তর হইতে স্বতঃস্ফুর্ত-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য কবিযাছি 'অনেক প্রগতিবাদী সাহিত্যিক এই গল্পটি সম্পর্কে অচেতন। ভাল লেখা প্রকাশিত হইলেই তাহাব গুণেব আলোকে সকলেব চোখে পড়ে, একথা সব সমষ জোব করিয়া বলা যায় না। ভাল লেখা চিনিতে পারাব জন্য পাঠক সমাজের ও প্রস্তুতির প্রযোজন আছে।"

'কমিউনিস্ট পবিবাব' প্রকাশের পবে রণেশ দাশগুপ্ত লেখেন, "মার্ক্সবাদী আবহে সাহিত্য সৃষ্টিব ক্ষেত্রে সৌবি ঘটক অন্যতম কথা শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত থাকিবেন।"

এব অনেক আগে 'কমবেড', 'দুই দেশ' ও 'রক্ত রাঙা নগবী' উপন্যাস তিনটি ও কিছু ছোট গল্প প্রকাশেব পব কবি বিমল ঘোষ লিখলেন, "মানিক চলে যাওয়াব পব মনটা ভেঙে গিযেছিল। বাংলা সাহিত্যেব ভবিষ্যৎ ভেবে মনে হতাশা জাগছিল। তুমি রূপকথাব বাজকুমাবেব মত তোমাব মার্ক্সবাদী প্রতিভাব পক্ষীবাজে চড়ে আমাব বুকেব হতাশার অন্ধকাব আলো কবে রূপকুমারী

আশাকে তোমার কলমের সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে দিয়েছ। তোমার কাছে আমি ঋণী।''

সৌরিবাবু কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তরুণ বয়স থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেন এবং সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন। তখনকার দিনে একটি সরকারি চাকুরির মূল্য মধ্যবিত্ত পরিবারে অকল্পনীয় ছিল। সৌরিদা কিন্তু লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করেন-নি। দিনাজপুর থেকে সরকারি আদেশে বিতাড়িত হয়ে তিনি কাটোয়ায় এসে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলার অন্যতম নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থেকে আন্দোলনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাই তাঁর লেখার মধ্যে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, জীবনকে যায় চেনা।

কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হাওয়ার পরে তিনি সি পি আই (এম)-এ যোগ দেন। পরে তিনি সি পি আইতে ফিরে আসেন।

১৯৯২ সালে 'কালান্তর' সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ার পর আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ না থাকলেও মাসে একদিন দেখা হতই। এ জি বেঙ্গলে প্রথমে আমরা কালান্তরের তিনজন এবং পরে আমরা দুজনে এক সঙ্গে রাজনৈতিক নির্যাতিত কর্মী হিসেবে পেন্সন নিতে যেতাম। শচীন সেন, সৌরী ঘটক আর আমি বেঞ্চে বসে একত্রে কত আলোচনা করেছি। মাঝে মাঝে আশু দত্ত আসতেন। ইতিমধ্যে শচীনদা চলে গেলেন—পড়ে রইলাম আমরা দুজন। একজন না এলেই অপরজনের মন খারাপ হয়ে যেত। গত ফেব্রুয়ারিতেও তাঁর সঙ্গে এ জি বেঙ্গলের বেঞ্চে বসে চা খেয়েছি, গল্প করেছি। এবং সেটাই শেষ দেখা।

তেভাগা আন্দোলন থেকে বহু ঘটনা পরিক্রমা করে সৌরিদা চলে গেলেন। পার্টি সদস্য পদ নবীকরণ করেননি বলে তিনি নিজেই একদিন আমাকে বলায় আমি তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভুল বলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি বলেছিলেন, ভেবে দেখব। প্রসঙ্গটা আর ওঠে নি, উঠবেও না। কিন্তু সৌরিদা মনে-প্রাণে কমিউনিস্ট ছিলেন। শেষের দিকে তাঁর মধ্যে একটা অভিমান লক্ষ্য করেছি। যে-মানুষটিকে তেভাগা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে সরকারি চাকুরি খোয়াতে হয় তাঁকে কিন্তু এই আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তিতে কোথাও স্বীকৃতি

জানানো হল না। রানীদির (রানী দাশগুপ্ত, যিনি দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন) সঙ্গে বসে তেভাগা আন্দোলন নিয়ে একটা দলিল তৈরি করবেন বলে মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীরটা আর চলছিল না। ভাগ্নি বিদ্যাকে নিয়ে শেষের দিকে এ জি বেঙ্গলে আসতেন। শরীরটা যে ক্রমশই খারাপ হচ্ছে তা তিনি বলতেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল —সৌরিদা ভাল হয়ে উঠবেন, আবার লিখবেন, আড্ডা মারবেন, রসিকতা করবেন, কমিউনিস্ট হিসেবে আরও বেশ কিছুদিন সমাজ-প্রগতির আন্দোলনে অংশ নেবেন। কিন্তু তা হল না। তিনি চলে গেলেন। অকৃতদার, মিষ্টভাষী, সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতা (প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক ছিলেন) এবং সাহিত্যিক সৌরিদা যেন কিছুটা অভিমান, ক্ষোভ নিয়েই চলে গেলেন।

এ জি বেঙ্গলের সেই বেঞ্চিটাতে প্রতি মাসে আমাকে একলাই বসে থাকতে হবে। সঙ্গে থাকবে সৌরিদার স্মৃতি।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

'শোক নয়, ক্রোধ'

১১ই জুন, ৯৭, বুধবার, কলেজ স্ট্রিট স্টুডেন্টস হলে জনসভা। এই হলে জনসভা কোন নতুন ঘটনা নয়। এমন কি কোন প্রতিবাদী জনসভাও, এই অঞ্চলের মানুষ, তার চেয়েও বড় কথা পথচলতি মানুষের কাছেও কোন বিরাট নতুন ঘটনা নয়। এই হলকে যদি প্রতিবাদী সভা হল বলা হয়, তাহলে যাঁদের জান-পহেচান যথেষ্ট আছে, তারাও শুনে চমকে উঠবেন না। কিন্তু এই ১১ই জুন চমকে ওঠার মতই একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

সিওয়ানে ছাত্রনেতা চন্দ্রশেখর এবং তাঁর সহযোগী এক কমরেড প্রকাশ্য দিবালোকে বিহারের মুখিয়া নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের অতি ঘনিষ্ঠ সাংসদ সাহাবুদ্দিনের পোষা ঘাতকরা যখন গুলি করে হত্যা করে, তার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ঢেউ ধিক্কার আর ঘৃণার সঙ্গে মিশে গোটা হিন্দি বলয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, ১১ই জুন এই হলে তারই অভিঘাত শোনা গেল। লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক নাগরিকদের উদ্যোগে আহুত এই সভায় এক উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল। বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার প্রসঙ্গে এই সমাবেশের একটা নিবিড় সংহতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একদিক থেকে তার চেয়েও বড় একটা তাগিদ ছিল সভায় উপস্থিত হওয়ার। সেটা ছাত্রনেতা শহীদ চন্দ্রশেখরের জননী কৌশল্যাদেবীর উপস্থিতি। বস্তুত সেই সভায় উপস্থিত না থাকলে, জননী কৌশল্যার কথা স্বকর্ণে না শুনলে, কোন বর্ণনাতেই শেষ এপ্রিলের সিওয়ানের সেই বিকেলের ঘটনা বোঝা যাবে না।

জননী কৌশল্যা সভার অনুরোধে যখন বলতে ওঠেন, তখন সেটা একটা মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। সিওয়ানের সেই বিকালে একমাত্র সন্তান চন্দ্রশেখরের নিথর দেহ আঁকড়ে জননী কৌশল্যা সব হারানোর ব্যথায় নিজের আর্তনাদকে যেভাবে ক্রোধে পরিণত করেছিলেন, এদিনও যেন সেটাই শোনা গেল। সভাস্থ সকল লোকের মাথার উপর দিয়ে একেবারে শূন্যের দিকে চেয়ে যখন তিনি, "এ লালু কান খুল কর শুন লে" শব্দগুলি মাঝে মাঝেই উচ্চারণ করছিলেন,

তখন তাঁর সেই দেহাতি হিন্দির সব কথা বোঝা না গেলেও তাঁর গলায় এমন একটা সুর বেজেছিল, স্বর উঠেছিল যা মানুষকে আলোড়িত করার পক্ষে যথেষ্ট। সেদিন তিনি সন্তানহারা মায়ের যে প্রতিবাদী চেহারা শোকের চরম মুহূর্তে প্রকাশ করেছিলেন, এই হলে সেটাই এক সামগ্রিক রূপ পায়।

সভার সভাপতি অরিজিৎ মিত্র থেকে শুরু করে নিপুণ বর্ণনায় জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় সেই প্রতিবাদে মানুষকে উদ্বেল হয়ে উঠতে আহ্বান করেন। বিহার থেকে আসা এই ঘটনার অন্যতম সাক্ষী এবং শহীদ চন্দ্রশেখরের সহাধ্যায়ী এবং কর্মজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত রামজী রায় দিল্লির জহওরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিহারের নানা শহরের প্রতিবাদী চেতনার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটাও মনে রাখার মত। সভায় অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন শৈবাল মিত্র, বাসব সরকার এবং কমলেশ সেন। সকলেই এই ঘটনার নানা দিকের প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কলকাতার নাগরিকদের প্রতিবাদী সত্তাকে ফুটে উঠতে সাহায্য করেন। হয়ত এরকম একটা সভার পরেই মনে হয় একটি মাত্র কথা, দরকার "শোক নয়, ক্রোধ"।

অর্কপ্রভ সরকার

P9/2

PARICHAY May–July '97 Reg. No. 13273
WB/EC—265

শারদীয় সংখ্যা

মহালয়ার আগেই বেরোবে।

সংপাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা–৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

 দাম : পনের টাকা